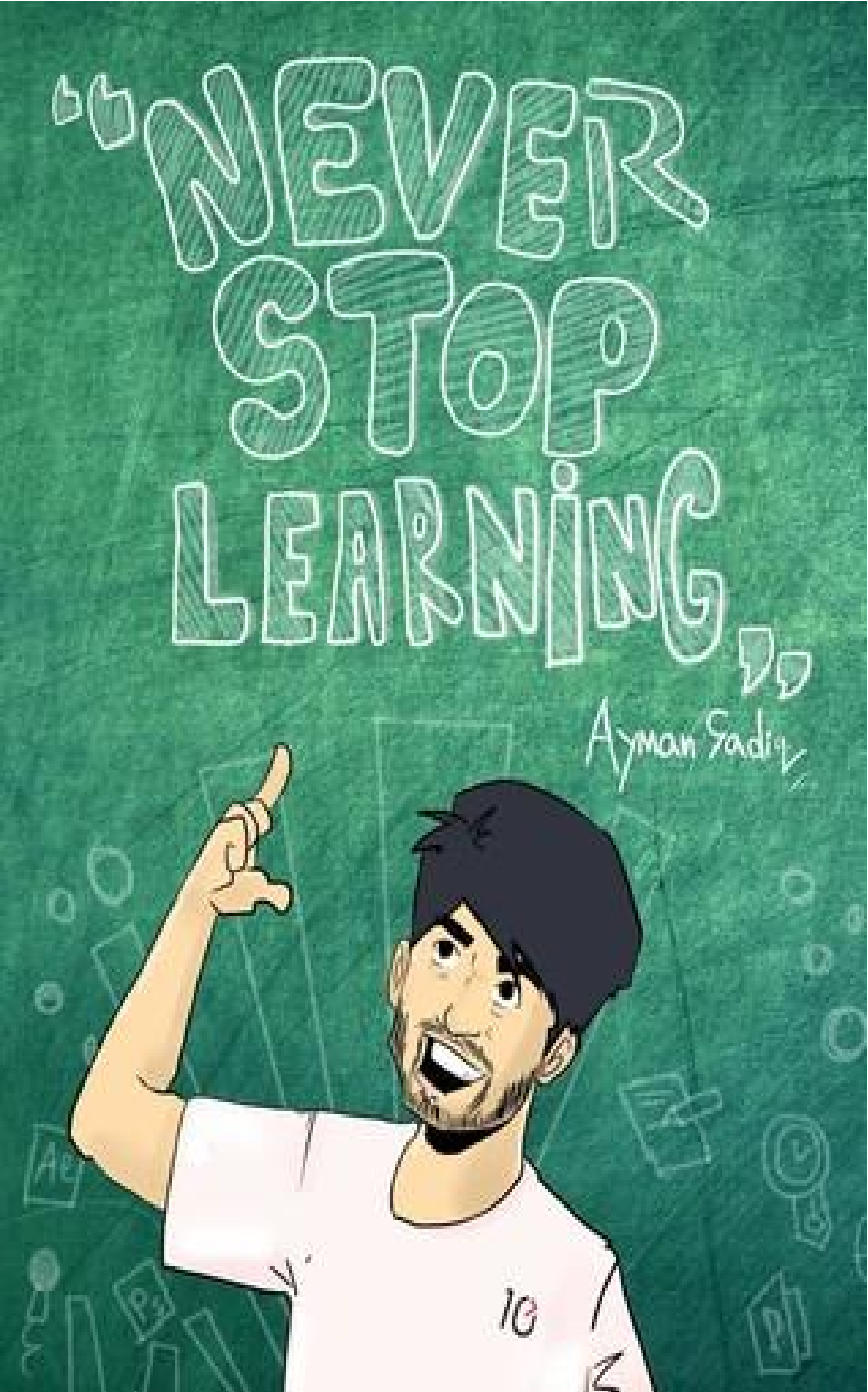
"NEVER STOP LEARNING"
Ayman Sadiq

নেভার স্টপ লার্নিং

আয়মান সাদিক

অধ্যয়ন

নেভার স্টপ লার্নিং
আয়মান সাদিক

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

ষষ্ঠ মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮			
পঞ্চম মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮			
চতুর্থ মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮	**নবম মুদ্রণ**	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
তৃতীয় মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮	**অষ্টম মুদ্রণ**	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮	**সপ্তম মুদ্রণ**	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৮			

অধ্যয়ন : ৬

প্রকাশক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি
অধ্যয়ন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
অন্তিক মাহমুদ

কম্পোজ
অধ্যয়ন কম্পিউটার

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
২নং গোপাল সাহা লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২৭০.০০

NEVER STOP LEARNING
By: Ayman Sadiq
First Published : February 2018, by Tasnova Adiba Shanjute,
Addhayan, 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : 270.00

ISBN-978-984-8072-05-9

উৎসর্গ

সৎ, নির্ভীক, আলোকিত ও
সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে বিভোর
দৃঢ়প্রত্যয়ী তরুণ প্রজন্মকে!

ভূমিকা

শেখার কোনো নির্দিষ্ট সময়, স্থান কিংবা সীমা-পরিসীমা নেই। আমরা প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানছি ও শিখছি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবন ও কর্মমুখী শিক্ষাও সমভাবে প্রয়োজনীয়।

আর তাই, সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করতে আমাদেরকে বেশিকিছু কৌশল রপ্ত করতে হবে। এ কৌশল বা আইডিয়াগুলোই আমাদের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

এ বইটিতে এমনই কিছু ছোট্ট ছোট্ট আইডিয়া, কৌশল, হ্যাক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে যাতে করে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়াকে প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি নিজেদেরকে দক্ষ, অভিজ্ঞ, যোগ্য, কুশলী এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাটাকেও প্রাধান্য দেয় এবং প্রিয় বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করতে পারে।

সূচি

০১	আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও কিছু স্বপ্নের কথা	১১
০২	দৃষ্টিভঙ্গী বদলালেই বদলে যাবে জীবন	১৪
০৩	চীনা বাঁশের গল্প	১৭
০৪	মাদিবা থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা	২০
০৫	আমার ভর্তি যুদ্ধের গল্প	২৩
০৬	এবার মানসিক অশান্তিকে জানাও বিদায়	২৬
০৭	একটি ভিডিও বাঁচাতে পারে লক্ষ প্রাণ!	২৯
০৮	দোষটা কি আসলে তেলাপোকার?	৩২
০৯	গোলাপি হাতি থেকে রক্ষা পাওয়ার রহস্য	৩৫
১০	পৃথিবীর সবথেকে ভালো আইডিয়াগুলো কোথায় পাওয়া যায়?	৩৮
১১	সুন্দর মানসিকতা গড়ে তোলার ৬টি উপায়	৪০
১২	সিজিপিএ আসলে কতটা প্রয়োজন?	৪৩
১৩	মন ভালো করার টোটকা	৪৬
১৪	একজন বৃক্ষমানবের গল্প	৪৯
১৫	সময় বাঁচানোর শতভাগ কার্যকর কৌশল!	৫২
১৬	ফেসবুক সদ্ব্যবহারের ৩টি কার্যকরী আইডিয়া	৫৫
১৭	ছাত্রজীবনে অর্থ উপার্জনের ১০টি উপায়	৫৮
১৮	ডিজিটাল ওরিয়েন্টেশন ও একটি স্বপ্নের কথকতা	৬২
১৯	শিক্ষাজীবনে যে ১০টি কাজ না করলেই নয়	৬৫
২০	প্রতিনিয়ত করে চলেছি যে ৪টি ভুল!	৬৯
২১	বিনোদনের ফাঁকে ফোকাস করো নিজের উন্নতি	৭২
২২	ভোকাবুলারি জয়ের ৫টি কৌশল	৭৫
২৩	অপরিচিতের সাথে কিভাবে ফোনে কথা বলবে	৭৭

২৪	সালাম দেয়া এবং ভালো গুণের প্রশংসা করা	৮০
২৫	“তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না” থেকে আত্মরক্ষার কৌশল	৮৩
২৬	একটি কমন অভ্যাস	৮৬
২৭	পরিশ্রমকে হ্যাঁ বলো	৮৯
২৮	প্রতিযোগিতায় যে গুণগুলো থাকা প্রয়োজন	৯১
২৯	আইডিয়াকে কাজে লাগাও, সাফল্যের পথে পা বাড়াও	৯৪
৩০	মার্শমেলো টেষ্ট ও দুরদর্শীতা	৯৬
৩১	নিজেকে জানো	৯৮
৩২	কিন্তু সিজিপিএ?	১০০
৩৩	নিয়ন্ত্রণে রাখো নিজের সুখ	১০১
৩৪	হয়ে ওঠো পাওয়ার পয়েন্টের জাদুকর	১০৪
৩৫	টলারেন্স নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা	১০৭
৩৬	চ্যাটিং করা থেকে যদি দারুণ কিছু হয়, চ্যাটিং করা ভালো!	১০৮
৩৭	রাজার অসুখ আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	১১১
৩৮	আমার প্রথম পাবলিক পরীক্ষা আর ডোপামিন ইফেক্টের গল্প	১১৩
৩৯	বিশ্ববিদ্যালয় জীবন গড়ে তোলো এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রম দিয়ে	১১৬
৪০	Sunk Cost-কে ‘না’ বলো, সাফল্যের পথে এগিয়ে চলো!	১১৯
৪১	ইন্টারভিউয়ের কথকতা	১২১
৪২	এখনই লিখে ফেলো তোমার সিভি!	১২৪
৪৩	ফেসবুকের সঠিক ব্যবহার করে হয়ে ওঠো আদর্শ নাগরিক!	১২৭
৪৪	সময় নষ্টের মূলে যে ৮টি কারণ	১৩০
৪৫	সময় ব্যবস্থাপনার ৫টি কার্যকর কৌশল	১৩৪
৪৬	সমালোচনা	১৩৭
৪৭	নিজেকে জানা, Elevator Pitch এবং আমাদের অবস্থান!	১৩৯

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও কিছু স্বপ্নের কথা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও তা পুরোপুরি যুগোপযোগি এবং বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেনি। শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য এখনও ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীদের মূল লক্ষ্য ভালো ফলাফল করা অন্যদিকে শিক্ষার লক্ষ্য হলো কর্মক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী, সুস্থ, দক্ষ ও সুন্দর মানসিকতা সম্পন্ন আলোকিত নাগরিক তৈরী করা। নিরস শিক্ষাপোকরণ যেমন শিক্ষার্থীদের উৎসাহে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে তেমনি ভালো ফলাফল করার অসুস্থ প্রতিযোগতিাও শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত শিক্ষা হতে বঞ্চিত করছে। আমি স্বপ্ন দেখি শিক্ষার্থীরা ফলাফলের উদ্বিগ্নতায় না ভুগে নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আনন্দের সাথে তাদের নিজ নিজ পছন্দের বিষয়ে বাস্তব সম্মত ও আধুনিক শিক্ষা অর্জন করবে।

তাই ভাবলাম, স্বপ্নগুলো না হয় লিখেই ফেলি, জানিয়ে দেই পুরো বিশ্বকে!

১. যা শিখছি বুঝে শিখছি:

আমরা অনেক সময় না বুঝে না জেনে অনেক কিছু পড়ে ফেলি, মুখস্ত করে ফেলি। আমরা কিন্তু জানিও না আসলে এই শিক্ষাটা আমাদের ঠিক কোন কাজে লাগবে, কেন কাজে লাগবে।

আমি স্বপ্নে দেখি, এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীরা কোনোকিছু পড়ার আগে জানবে, কেন তারা সেটি পড়ছে? তাদের পরিষ্কার ধারণা চলে আসবে যে, এ বিষয়টি পড়লে তারা এভাবে উপকার পাবে। তাদের মনে আর প্রশ্ন জাগবে না যে, এসব পড়ে কি হবে? কি লাভ?

২. গোল্ডেন নয় শেখার জন্যে পড়ালেখা:

একটা সময় ছিল যে কেউ গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পেলে আমার খুব ভালো লাগত। মনে হতো যে অসাধারণ একটা কাজ করে ফেলেছে সেই ছেলেটি বা মেয়েটি। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন কেউ গোল্ডেন পেলে

আমার মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। মনে হয় এই রেজাল্টের জন্যে শিক্ষার্থীটিকে কতই না ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, বাবা মা নিশ্চয়ই তাকে গন্ডায় গন্ডায় কোচিং প্রাইভেট আর মডেল টেস্টের জ্বালাতনে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রেজাল্ট একটুখানি খারাপ হলে না জানি তার বাবা মা তাকে কত বকাঝকা করেছেন!

তাই আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনের, যখন শুধু গোল্ডেন জিপিএ পাবার জন্যে কেউ পড়ালেখা করবে না, শেখার জন্যে পড়ালেখা করেই গোল্ডেন পেয়ে যাবে।

৩. Never Stop Learning:

এমন এক যুগে আমাদের বসবাস, যেখানে আমরা সিলেবাসের বাইরে এতটুকুও পড়তে চাই না। সিলেবাস তো সিলেবাসই, এর মধ্যেও আমরা শুধু পড়তে চাই পরীক্ষায় যেগুলো আসতে পারে। সাজেশন নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু ব্যাপারটা হলো, শেখার কোনো শেষ নেই।

মানুষ হিসেবে আমরা সবাই এক-একটা বইয়ের মত। কেউ হয়তো ফিলোসফির বই, কেউ ফিজিক্সের। সবার কাছেই কিছু না কিছু শেখার আছে। সেজন্যে শেখার মানসিকতাটা ধরে রাখতে হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন আমরা শিখে যেতে পারি, সে স্বপ্নই দেখি আমি।

৪. মুখস্ত নয় বুঝে পড়োঃ

নকল করা খুব খারাপ একটা কাজ। বাড়ী থেকে মুখস্ত করে এসে পরীক্ষা হলে উত্তর দেয়াটাও কিন্তু একরকম নকলই বলা চলে! একগাদা তথ্য মুখস্ত করে সেটা দিয়ে পরীক্ষায় পাশ করাটা মোটেও কাম্য নয়। মুখস্ত করার দরকার আছে, কিন্তু অবশ্যই সেটি বুঝে বুঝে করতে হবে। তাই আমি স্বপ্ন দেখি এমন এক বাংলাদেশের, যেখানে সব ছাত্র ছাত্রী ঝাড়া মুখস্ত না করে বুঝে বুঝে পড়ালেখা করবে।

৫. পড়ালেখার পাশাপাশি সহশিক্ষাকে কৃতিত্বদানঃ

আমাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা ঢুকে গেছে যে, সিজিপিএ বা জিপিএতে ভালো গ্রেডিং অর্জনই হচ্ছে জীবনের সব। এছাড়া জীবনে ভালো কিছুই করার নেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, বিভিন্ন মানুষ কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে

আমার মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। মনে হয় এই রেজাল্টের জন্যে শিক্ষার্থীটিকে কতই না ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, বাবা মা নিশ্চয়ই তাকে গন্ডায় গন্ডায় কোচিং প্রাইভেট আর মডেল টেস্টের জ্বালাতনে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রেজাল্ট একটুখানি খারাপ হলে না জানি তার বাবা মা তাকে কত বকাঝকা করেছেন!

তাই আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনের, যখন শুধু গোল্ডেন জিপিএ পাবার জন্যে কেউ পড়ালেখা করবে না, শেখার জন্যে পড়ালেখা করেই গোল্ডেন পেয়ে যাবে।

৩. Never Stop Learning:

এমন এক যুগে আমাদের বসবাস, যেখানে আমরা সিলেবাসের বাইরে এতটুকুও পড়তে চাই না। সিলেবাস তো সিলেবাসই, এর মধ্যেও আমরা শুধু পড়তে চাই পরীক্ষায় যেগুলো আসতে পারে। সাজেশন নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু ব্যাপারটা হলো, শেখার কোনো শেষ নেই।

মানুষ হিসেবে আমরা সবাই এক-একটা বইয়ের মত। কেউ হয়তো ফিলোসফির বই, কেউ ফিজিক্সের। সবার কাছেই কিছু না কিছু শেখার আছে। সেজন্যে শেখার মানসিকতাটা ধরে রাখতে হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন আমরা শিখে যেতে পারি, সে স্বপ্নই দেখি আমি।

৪. মুখস্ত নয় বুঝে পড়োঃ

নকল করা খুব খারাপ একটা কাজ। বাড়ী থেকে মুখস্ত করে এসে পরীক্ষা হলে উত্তর দেয়াটাও কিন্তু একরকম নকলই বলা চলে! একগাদা তথ্য মুখস্ত করে সেটা দিয়ে পরীক্ষায় পাশ করাটা মোটেও কাম্য নয়। মুখস্ত করার দরকার আছে, কিন্তু অবশ্যই সেটি বুঝে বুঝে করতে হবে। তাই আমি স্বপ্ন দেখি এমন এক বাংলাদেশের, যেখানে সব ছাত্র ছাত্রী ঝাড়া মুখস্ত না করে বুঝে বুঝে পড়ালেখা করবে।

৫. পড়ালেখার পাশাপাশি সহশিক্ষাকে কৃতিত্বদানঃ

আমাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা ঢুকে গেছে যে, সিজিপিএ বা জিপিএতে ভালো গ্রেডিং অর্জনই হচ্ছে জীবনের সব। এছাড়া জীবনে ভালো কিছুই করার নেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, বিভিন্ন মানুষ কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে

ভালো। একটা বনে একটা বাঁশ পুতে দিয়ে যদি সিংহ, নেকড়ে, বাঘ, হাতি আর বানরকে বলা হয় যে, যে প্রাণী আগে বাঁশে চড়তে পারবে, সে-ই সেরা। তাহলে বানর হেসেখেলে চড়তে পারবে সেখানে। তার মানে কি সে সেরা? মোটেও না!

একইভাবে, সিজিপিএ ভালো না হলেই যে সে ভালো নয়, এমন ধারণা পাল্টাতে হবে। কেউ হয়তো ভালো ছবি আঁকে, ভালো গান গায়, ভালো কবিতা লেখে যা সিজিপিএতে কখনো আসবে না। তাই বলে কি এসব গুণের কোন মূল্য নেই? আমার স্বপ্ন হলো, এমন একটা দিন আসবে যখন একাডেমিক পড়ালেখার কৃতিত্বের পাশাপাশি এসব সহশিক্ষাকেও কৃতিত্বের সাথে দেখবে সবাই!

৬. বুদ্ধির পরিচয় শুধু পড়ালেখায় নয়ঃ

অনেকেরই ধারণা, বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার একমাত্র উপায় হলো পড়ালেখা। পড়ালেখায় ভালো তো সে বুদ্ধিমান আর পড়ালেখায় খারাপ তো তার বুদ্ধি কম। কিন্তু আমি বলব, পড়ালেখায় ভালো হওয়াটা বুদ্ধিমত্তার স্রেফ একটা অংশ। এছাড়াও অনেক কিছু আছে, যেগুলো না জেনে শুধু পড়ালেখায় ভালো হলে তাদের দিয়ে পৃথিবীর খুব বেশি উপকার আসলে হয় না। তাই আমি স্বপ্ন দেখি, বাংলাদেশের সবাই পড়ালেখার পাশাপাশি অন্যান্য সহশিক্ষামূলক কাজেও উদ্বুদ্ধ হবে।

সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশে পড়ালেখাটা আসলে মোটেও আনন্দের নয়। কিন্তু সেটিকে যদি আনন্দময় করে তোলা যেত, শিক্ষার্থীরা যদি হাসতে হাসতে শিখতো, তাহলে ব্যাপারটা অসাধারণ হতো না? আমাদের এই স্বপ্নগুলো পূরণ হলে আমরা এমন এক বাংলাদেশ দেখব, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের সাথে শিখছে। ভাবতেই কি দারুণ লাগে, তাই না?

দৃষ্টিভঙ্গী বদলালেই বদলে যাবে জীবন

আমাদের তরুণ প্রজন্মের বড় একটা অংশকে আমি দেখি হতাশায় ভুগতে। তারা অনেক ডিপ্রেসড জীবন নিয়ে মহা চিন্তিত। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই হতাশা আসছে কোত্থেকে? উত্তর মেলে, এই হতাশার মূলে আছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। এই এক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে পারলে কিন্তু জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যায়, জীবনের অঙ্ক মেলাতে আর হতাশ হতে হয় না। আজ তাই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে সুখী একটা জীবন পাবার তিনটি উপায় বলে দিচ্ছি।

১. সবকিছুকে কঠিন করে না নিয়ে সহজভাবে চিন্তা করঃ

আমাদের সবারই কিন্তু এ ধরনের বন্ধু আছে যারা সবসময় বলতে থাকে "দোস্ত আমার কী হবে, আমি পড়া কিচ্ছু পারি না!" আর রেজাল্ট বের হলে দেখা যায় ফাটাফাটি একটা নম্বর পেয়ে যায় তারা। আবার আরেক রকম বন্ধু আছে যারা বেশি পড়ালেখা করে না, আর সেটি নিয়ে তাদের মাথাব্যথাও নেই। একশতে পাশ নম্বর চল্লিশ তুলতে পারলেও তারা খুশি।

প্রথম ধরনের বন্ধুদের মনে সবসময় চলতে থাকে যে, বেশি করে ভালোমত পড়াশোনা না করলে রেজাল্ট খারাপ হবে, তার চাকরি-বাকরি হবে না, বিয়ে হবে না, কিচ্ছু হবে না! তার জীবনে নেমে আসবে মহা অন্ধকার। আর দ্বিতীয় ধরনের বন্ধুদের মাথায় খেলা করে অন্য বিষয়। পরীক্ষা তাদের কাছে স্রেফ একটা পরীক্ষাই। এটায় খারাপ করলে পরেরটায় ভালো করবে, সুযোগের তো আর অভাব নেই এমনই চিন্তাধারা তাদের। তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে, স্রেফ দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা বলে দুজন বন্ধুর পরীক্ষা নিয়ে ধারণা বেমালুম আলাদা হয়ে যাচ্ছে!

আমাদের জীবনটাও কিন্তু ঠিক এরকমই। চারপাশে তাকালে দেখা যাবে প্রচুর মানুষ আছে যারা অনেক কিছু করেও সুখী না, তাদের কাছে জীবনটাই একটা হতাশার নাম, সবকিছুই কঠিন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। ভালো কিছু করলেও সেটিকে তাদের কাছে অনেক কম মনে হয়!

কিছু মানুষ আবার জীবনটাকে খুব সহজভাবে নেয়। তাদের কাছে সম্ভাবনা এলে তারা তা হাসিমুখে গ্রহণ করে, সাফল্য পায়। আবার ব্যর্থতায় ভেঙে না পড়ে তারা নতুন কিছুর পথে এগিয়ে যায়। সবকিছুকে সহজভাবে নেয়ার বিরল প্রতিভা তাদের।

আমরা আমাদের জীবনকে কীভাবে গড়ব, সেই বন্ধুদের মত বড্ড কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চালাতে পারি, আবার দ্বিতীয় শ্রেনির এই মানুষগুলোর মত সহজ দৃষ্টিভঙ্গিতেও রাখতে পারি। Choice কিন্তু আমাদের হাতেই!

২. নিজের জীবন থেকেই খুঁজে নাও সুখ:

একটা গল্প বলি। দুটো বাচ্চার গল্প। একজন থাকে মস্ত একটা আলিশান বাড়ির আঠারো তলায়। আঠারো তলার জানালা থেকে সে দেখে, ছেড়া একটা হাফপ্যান্ট পরে আরেকটা বাচ্চা বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলছে। আলিশান বাড়ির বাচ্চাটাকে তার মা নামতে দেয়নি, বৃষ্টিতে খেললে যদি তার অসুখ করে!

আলিশান বাড়ির বাচ্চার মনে বড় কষ্ট। তার মনে হয় সে যদি এই ছেলেটা হতো, তাহলে বুঝি কতই না মজা করে বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলতে পারতো! মজার ব্যাপার হলো, ঠিক ওই সময় নিচের বাচ্চাটার মনে চলছে আরেক কথা। তার বাসায় অভাব, অনাহার। তার মনে হয় সে যদি ওই আলিশান বাড়ির ছেলেটা হতো, তাহলে না জানি কী সুখে থাকতে পারতো! বড় বাসা, ভালোজামা কাপড় ভালো খাবার সবই পেত সে!

পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেও এই সমস্যাটা বিদ্যমান। অন্য মানুষ কী করে, তারা কেমন সুখে আছে এটি নিয়েই তারা প্রতিনিয়ত চিন্তিত। হতাশা তাদের শেষ হতেই চায় না! অথচ অন্যের জীবন নিয়ে না গবেষণা করে নিজের জীবনের খুঁটিনাটি একটু দেখলে, দুঃখভরা জায়গাগুলো একটু ভালো করার চেষ্টা করলে কিন্তু খুব ভালো থাকা যায়।

অন্যের কথা না ভেবে, অন্যের পথে না চলে, নিজেই নিজের জীবন গড়ে তুলতে পারলে আর কিছু লাগেই না। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টালে তাই জীবনটাও হয়ে যাবে অনেক সুখের।

৩. স্বপ্নগুলোকে উড়তে দাওঃ

প্রবাদ আছে, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই ২৫ বছর বয়সে মরে যায় আর পঞ্চাশ বছর পর তার দেহটা কবর দেয়া হয়। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কথাটা সত্যি। ২৫ বছরে গ্রাজুয়েশনের আগে আমাদের মনে কতই না স্বপ্ন থাকে, এটা করবো সেটা করবো। একের পর এক আইডিয়া আসতে থাকে মাথায়। দিতে ইচ্ছে করে ইউরোপ ট্যুর, আরো কত কি! কিন্তু গ্রাজুয়েশনের পর পরিবার থেকে চাপ আসে বিয়ে করতে হবে, চাকরি নিতে হবে।

চাকরিগুলো বেশিরভাগ সময়েই মনমতো হয় না, হতাশা বাড়তে থাকে। সাথে থাকে সংসার চালানোর চাপ, আর জীবন হয় কষ্টের। সেই যে স্বপ্নগুলোর মৃত্যু হলো মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধের চাকরি করে আর সংসারের ঘানি টেনে, সেখানেই আমাদেরও আসলে মৃত্যু হয়। থাকে শুধু নিরস দেহটাই।

কিন্তু এমনটা হবার তো কোনো দরকার নেই! নিজের চিন্তা-ভাবনাকে একটু পাল্টিয়ে দেখি আমরা। চিন্তা করে দেখি, নিজের জন্যে, দেশের জন্যে বলার মত কী করছি আমরা, যদি কিছু না করেই থাকি, তাহলে করা শুরু করতে দোষ কী? বয়সটা হোক পঞ্চাশ কিংবা আরো বেশি, কাজের কাজ করলে সেটি কোনো বাধাই নয়। নিজে কিছু করা শুরু করলেই দেখবে নিজেরও ভালো লাগছে, ইচ্ছে করেছে আরো ভালো কাজ করতে!

চীনা বাঁশের গল্প

আমাদের দেশে আমরা এই যে গ্রামে গেলেই বাঁশঝাড় দেখি, এগুলো হতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না, মোটামুটি দ্রুতই বেড়ে ওঠে বাঁশগুলো। চীনা বাঁশের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও এরকম না! চীনা বাঁশের কাহিনীটা একটু আলাদা।

ধরো তুমি একটা চীনা বাঁশের বীজ বপন করলে। এরপর তোমাকে সেই বাঁশটাকে পানি দিতে হবে, সার দিতে হবে, অনেক যত্নআত্তি করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, নিয়মিত খেয়াল রাখতে হবে তার, পাশাপাশি অন্যান্য কাজগুলোও নিয়মিত করতে হবে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এত কিছু করার পর দেখা যায় প্রথম বছরে চারার নামগন্ধ নেই, সেটি বাড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। প্রথম বছর যায়, দ্বিতীয় বছর আসে। এ বছরেও কোনোরকম লক্ষণ দেখা যায় না। তৃতীয় বছরেও যখন দেখা যায় না কোনো সম্ভাবনা, অনেকেই মনে করতে থাকে বীজটা মরে গেছে। বাঁশ হবার সম্ভাবনা নেই। এই করেই একেবারেই নিষ্ফল চতুর্থ বছরও যখন যায়, তখন মোটামুটি সবাই আশা ছেড়ে দেয় বাঁশ হবার।
চমক দেখা যায় এর পরপরই। চতুর্থ বছরের শেষে দেখা গেল ছোট্ট একটা চারার মত উঠেছে সেখান থেকে। পরের দিন থেকেই তুমি দেখবে হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে চীনা বাঁশগুলো! এক ফিট, দু ফিট করতে করতে এই দেখা যাবে ৫ সপ্তাহে ৯০ ফুটি দানব বাঁশে পরিণত হয়েছে এই চীনা বাঁশগুলো!

একেবারে হাল ছেড়ে দেয়ার অবস্থা থেকে রাতারাতি এই অস্বাভাবিক উন্নয়ন একটু ভাবার বিষয়ও বটে। বাঁশ গাছ থেকে এ শিক্ষাটা আমাদের জীবনেও নেয়া যেতে পারে। কীভাবে? এই পাঁচ বছরে চীনা বাঁশ কিন্তু থেমে থাকেনি, তারা মাটির তলে শক্ত ভিত গড়ে তারপরেই মাথা তুলে দাড়িয়েছে। জীবনে এই জ্ঞানটা কাজে লাগাতে পারলেই কেল্লাফতে! এই বাঁশ থেকেই জীবনের দরকারি ৩টা শিক্ষা নেয়া যায়ঃ

১. সবকিছুর শুরু সেই ভিত্তি থেকেই:

চীনা বাঁশগুলো কিন্তু একেবারেই বড় হয়ে যায় নি। কারণ মূল শক্ত না হলে ৯০ ফুটি একটা বাঁশ দাঁড়াতেই পারবে না, এইজন্যে পাক্কা ৫ বছর ধরে এটি শুধুমাত্র মাটির তলে নিজের মূল-শেকড় ঠিক করেছে। আর ঠিক এই কারণেই যত ঝড়-ঝাপটা আসুক, যে দুর্যোগই হোক, চীনা বাঁশ টিকে থাকবে স্বমহিমায়! অন্যদিকে অন্য সাধারণ বাঁশের মত হলে সেগুলোর মত চীনা বাঁশও সহজে ভেঙে পড়ত।

আমাদের জীবনটাও অনেকটা এরকমই। জীবনে আমরা দুই ধরনের সাফল্যের পেছনে ছুটতে পারি। দ্রুত এবং ক্ষণিকের বা শর্ট টার্ম সাফল্য, আর বিলম্বিত বা লং টার্ম সাফল্য। শর্ট টার্মে তুমি বেশ সফল হয়ে যেতে পার, কিন্তু তোমার এই সাফল্য বেশিদিন থাকবে না। অন্যদিকে লং টার্ম হতে অনেক সময় নিলেও, দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য নিশ্চিত! তাই নিজেকে গোড়া থেকে তৈরি কর, নিজের বেসিক ভালো করে তারপর নিজেই এগিয়ে যেতে থাকো সাফল্যের দিকে।

২. ছোট ছোট ধাপে এগিয়ে যাও:

চীনা বাঁশগুলো কিন্তু রাতারাতি বিশাল বড় হয়ে যায়নি। তারা সময় নিয়েছে, এবং একটা সময়ে এসে এগুলো বড় হয়েছে। টানা ৫ বছর ধরে ছোট ছোট ধাপে এরা নিজেদের মূলের উন্নতি করেছে, সেগুলোকে ধারণক্ষম করেছে। তারপরই না এদের সগর্ব আত্মপ্রকাশ!

আমাদের জীবনটাও এমনই। তুমি চাইলেই হুট করে বিশাল কোনো সাফল্য পেয়ে যেতে পার না। সময় লাগবে, শ্রম আর ভাগ্যের সহায়তাও লাগবে। তাই তুমি যে কাজে ভালো, যা নিয়ে তোমার আগ্রহ আছে; সেটি তুমি তোমার মতো করে ছোট ছোট ধাপে করতে থাকো, উন্নত হও। একটা সময়ে দেখবে তুমিও সেই চীনা বাঁশের মতো বিশাল মহীরুহ হয়ে উঠছে!

৩. অধ্যবসায়, ধৈর্য, বিশ্বাস:

চীনা বাঁশ যখন ৪ বছরেও হচ্ছিল না, তখন অনেকেই হতাশ হয়ে আর যত্ন আত্তি করেনি বাঁশের। তাদের মনে বিশ্বাস ছিল না। তারা ভেবেছিল এই

গাছ মরে গেছে। কিন্তু আর একটা বছর পরে যে একটা মহীরুহ জন্মাবে সেই ছোট্ট জায়গাটিতে, সে খবর তারা জানত না। যারা কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে দিনের পর দিন গাছের যত্ন নিয়েছে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে–তারাই বিশাল বাঁশের মালিক হতে পেরেছে।

আমাদের জীবনেও এই তিনটি গুণের খুব বেশি দরকার। তুমি জীবনে সফলতার মুখ সহজে নাও দেখতে পার, হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে থাকতে পার। কিন্তু তাতে যদি হাল ছেড়ে দাও তাহলে কোনো লাভ নেই। অধ্যবসায় দেখাও, লেগে থাকো যে কাজটি ভালোবাস তার পেছনে। একটু ধৈর্য ধরো, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো– সাফল্য আসবেই!

চীনা বাঁশের গল্পটি শুধু গল্প নয়, জীবন বদলে দেয়ার মত একটি অনুপ্রেরণা এটি। আশা করছি সবাই মিলে চেষ্টা করবে সুন্দর ও সফল জীবন গড়ার!

মাদিবা থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা

দক্ষিণ আফ্রিকার একজন কিংবদন্তির নাম শোনেনি এ পৃথিবীতে এমন মানুষের দেখা পাওয়া ভার। অনেকে তাকে চেনে মাদিবা হিসেবে, অনেকের কাছে তিনি নিপীড়িতদের মুক্তির দূত। শত বর্ণবাদ দূর করে এই মানুষটি এগিয়ে গিয়েছিলেন মুক্তির পথে, হয়েছিল একটি দেশের জাতির পিতা। শুধু তাই নয়, পুরো বিশ্বে অনুপ্রেরণার আরেক নাম তিনি। নাম তার নেলসন ম্যান্ডেলা।

যদি প্রশ্ন করা হয় ত্যাগ ও তিতিক্ষার চরমতম প্রমাণ দিয়ে কে নিজের আদর্শকে বাস্তবায়ন করেছেন? উত্তর আসবে, নেলসন ম্যান্ডেলা। কিছুদিন আগে প্রয়াত কিংবদন্তীতুল্য এই মানুষটি পুরো বিশ্বের কাছে পরিচিত তার সংগ্রাম আর ক্ষমাশীলতার জন্যে। তার গল্প শুনে আসি তাহলে!

একজন বিপ্লবীর উত্থান

তরুণ ম্যান্ডেলার মনে সবসময় বিরাজ করত একটি স্বপ্নবর্ণবাদহীন, শান্তি পূর্ণ একটি দক্ষিণ আফ্রিকার। সে লক্ষ্যে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। সুষ্ঠু আর সুন্দর এক শাসনব্যবস্থার স্বপ্ন ছিল তার মনে। বর্ণ যাই হোক, সবার অধিকার সমান–এই লক্ষ্যে লড়াইটা তিনি শুরু করেছিলেন তখন থেকেই। জনপ্রিয়তার শুরু টা সেখানেই। পুরো দক্ষিণ আফ্রিকা যখন সম অধিকারের জন্যে গনগনে কড়াই হয়ে উঠেছিলো, সেসময়ে ম্যান্ডেলাই ছিলেন বিপ্লবের মধ্যমণি।

কারারুদ্ধ

ম্যান্ডেলার এই অবাক উত্থান শাসকদের মোটেও পছন্দ হয়নি। জনতার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে তারা ক্রমশ নিজের শত্রু ভাবতে শুরু করেছিল। আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই, তাই হত্যাচেষ্টাও হয় তার উপর। যদিও মানুষের ভালোবাসাই বারবার বাঁচিয়ে দেয় তাকে। কিন্তু একটা সময় সরকার তাকে ধরে ফেলে। ম্যান্ডেলার বহু বছরের জেল হয়। তৎকালীন সরকার প্রধান F.W. De klerk এর দেয়া কারাবন্দিত্ব মেনে নিতে হয় মাদিবাকে।

জেলজীবন

কারাগারের জীবনটা খুব সুখের ছিল না ম্যান্ডেলার জন্যে। অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন, নিজের প্রিয় দেশটার দুরবস্থা মেনে নিতে বড় বেশি কষ্ট হচ্ছিল তার। পরিবারকে রেখে থাকাটা কষ্টকর, দেশের মানুষগুলোর দুঃখে নিজেও দুঃখিত হতেন তিনি। কিন্তু আগুনের দিন শেষ হচ্ছিল না। জেলজীবনে এই মানুষটা যেই অধ্যবসায় আর দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই অনন্য।

মুক্তি

অবশেষে মুক্তির দিন ঘনিয়ে এলো। তুমুল বিপ্লবের মুখে নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পেলেন টানা ২৭ বছর কারাবন্দী থাকার পর। তারপরের গল্পটা বিজয়ের। যে ম্যান্ডেলাকে দুই যুগেরও বেশি জেলে বন্দী থাকতে হয়েছে, সেই মাদিবা ধীরে ধীরে দেশের প্রধান হয়ে উঠলেন! প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা, আর শপথ নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সকল সমস্যার সমাধান তিনি করবেনই, শান্তিপূর্ণভাবে! ধৈর্যশীলতার অনন্য নিদর্শন দেখালেন মাদিবা, বিশ্ব অবাক হয়ে দেখল তাঁর কীর্তি!

এ কেমন ক্ষমা?

সাধারণ কোনো নেতা নির্দোষ হয়েও ২৭ বছর জেল খেটে আসলে তাকে যে কারাবন্দী করেছে তার সঙ্গ ত্যাগ করে, প্রতিশোধ নেয় বা নিদেনপক্ষে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ম্যান্ডেলা যে অস্বাভাবিক রকম উদার একজন নেতা!

তিনি দূরদর্শিতা দেখালেন, তাই প্রতিশোধ, রাগ কিছুই দেখালেন না। উল্টো নিজে প্রেসিডেন্ট হয়ে ২৭ বছর আগে তাকে কারাবন্দী করা F.W. De klerk কে নিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট বানালেন গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়ে। সকল শত্রুকে ক্ষমা করে দিলেন তিনি, এমন মহানুভবতা পৃথিবীর ইতিহাসে বড়ই বিরল।

ম্যান্ডেলা যখন প্রথম প্রেসিডেন্ট হন, দক্ষিণ আফ্রিকা তখন তুমুল বিপর্যস্ত একটি দেশ। বর্ণবাদ ছড়িয়ে গেছে সবদিকে, প্রকাশ্যে খুন-ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সবাই ধরেই নিয়েছিল, একটা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ

কিংবা আর্মিদের ক্ষমতা নেয়া ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে কখনোই দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখানে ম্যান্ডেলা আবারও বিস্ময় দেখালেন। দেশটি থেকে বর্ণবাদ দূর করলেন কোনোরকম রক্তক্ষয় ছাড়াই। শান্তির বাণী ছড়িয়ে ধ্বংসপ্রায় একটা দেশকে উন্নত করার দিকে নিয়ে গেলেন মাদিবা। আর প্রমাণ করলেন, Positive Energy থাকলে সবই সম্ভব। নিজের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব থাকলে অনেক কিছুই করে ফেলা যায়। এ যেন 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়' প্রবাদটির আফ্রিকান প্রমাণ!

বন্ধুদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হয়, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়, এটি অনেক সময় কদর্য একটা আকারও নিয়ে নেয়। অথচ ম্যান্ডেলা তাকে ২৭ বছর জেলে বন্দী করা মানুষটার সাথে মিলে দেশ চালিয়েছেন! এখান থেকে তোমাদের অণুপ্রেরণা নেয়া উচিত, যে ম্যান্ডেলা পারলে তুমিও পারবে।

জীবনে সুখী থাকার খুব দরকারি একটা টিপস হলো Negative Energy কে নিজের ভেতর থেকে বের করে দেয়া। জীবন থেকে সব রকম নেতিবাচক চিন্তা চলে গেলেই সুখী, সুন্দর জীবন হবে সবারই।

আমার ভর্তি যুদ্ধের গল্প

আমার ভর্তিযুদ্ধের শুরু টা হয় একটা বড় ধাক্কার মধ্য দিয়ে। সে এমন এক কাহিনি, ভাবলে এখনো অবাক লাগে!

খুলেই বলি। সবে এইচ,এস,সি দিয়েছি। পরীক্ষার পরে যা হয় আর কী, মনের মধ্যে বেশ ফুরফুরে একটা ব্যাপার হচ্ছে। এর মধ্যেই আব্বু আম্মু ধরে বেঁধে একটা ভর্তি কোচিংয়ে ভর্তি করে দিলেন। বেশ নামজাদা কোচিং, একগাদা স্টুডেন্ট। সবার মুখ ভার, সবাই এমন সিরিয়াস চোখে তাকিয়ে আছে যেন প্রথম দিনই তাদের ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে! আমার উলটো এসব দেখে বেশ হাসিই লাগল, মনে হলো এরা অকারণেই এত সিরিয়াস, এসব কদিন পরেই কেটে যাবে!

প্রথম ক্লাস। বোরিং লেকচার হচ্ছিল ভেক্টর নিয়ে। এই চিহ্ন ওই চিহ্ন দেখতে দেখতে মাথাটা একটু ধরে এসেছিল। একটু পরেই দেখি, সেই ইন্টারনেট মিমগুলোর মতোই ফাঁকা বোর্ড ভরে উঠেছে একগাদা আঁকিবুঁকিতে! মাথায় হাত আমার, কিছুই তো বুঝলাম না! একটু পর আবার ভাইয়া বলে বসলো, পরের ক্লাসে পরীক্ষা নেয়া হবে। আমি আগাগোড়াই ফাঁকিবাজ মানুষ, মনে করলাম এমনিই হয়তো ভয় দেখাচ্ছেন ভাইয়া।

পরের ক্লাস। ভাইয়া এসেই বললেন পরীক্ষা নেবেন। আমার তো মাথায় বাজ পড়ল, প্রিপারেশনও তো নেইনি সেরকম! যাহোক, পাশে দেখি একজন দুটো ক্যালকুলেটর বের করলো। আমি দেখে অবাক, একটা ক্যালকুলেটর দিয়েই তো হয়ে যায়, দুটো কেন দরকার হবে? মুচকি হেসে ভাবলাম, এই ছেলে পাক্কা নার্ড মনে হয়! ওমনি দেখি পাশের জনও দুটো ক্যালকুলেটর বের করলো! সেটা আবার যে সে ক্যালকুলেটর নয়, ES 991 লেখা শক্তিশালী একটা ক্যালকুলেটর। আর আমি? একটাই ক্যালকুলেটর, সেটা আবার MS 100, নিজেকে মনে হলো Nokia 1100 ফোন নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে এসেছি আইফোনের সাথে!

পরীক্ষার প্রশ্ন বেশ কঠিন ছিল। অন্তত আমার কাছে আর কী! প্রিপারেশন নেইনি, আর জীবন তো রূপকথা না, তাই আমি এই পরীক্ষায় একশতে বিশের বেশি আর তুলতে পারলাম না। শুধু এই পরীক্ষাই না, পরের অনেকগুলো পরীক্ষায় বিশ পার হচ্ছিলই না! এখানে একটা সমস্যা ছিল, যে পরীক্ষার নম্বরগুলো বাসায় টেক্সট করা হয়। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম কারণ বাসার নম্বর দেয়া ছিল আম্মুর, আর আম্মু কখনো টেক্সট চেক করেন না! কিন্তু ওই যে, চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন! একদিন ফেঁসে গেলাম আমিও। আব্বু আম্মুর ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন, হুট করে তার চোখে পড়ল একগাদা মেসেজ। তিনি বলে উঠলেন, "আরে! এতগুলো টেক্সট এগুলো কিসের নম্বর!"

ডাক পড়ল আমার। তিনি তার সুপুত্রকে ডেকে বললেন, "বাবা, এ কী অবস্থা তোমার নম্বরের?"

আমি এযাত্রায়ও বেঁচে গেলাম এটা বলে, যে পরীক্ষাগুলো সব হয় বিশ নম্বরে! ভাগ্যক্রমে ওই মেসেজগুলোতে মোট নম্বর বলা হতো না, আর এই সুযোগে আরো একটাবার রক্ষা পেয়ে গেলাম!

বিড়ালেরও নয়টা জীবন থাকে, আমার ভাগ্য কী আর সবসময় ভালো হবে? হয়ও নি। সর্বনাশটা হলো অন্য আরেকদিন। আমার এক মহা ট্যালেন্টেড বন্ধু আমার সাথেই নিয়মিত পরীক্ষা দিতে যেত। তো একদিন আমাদের গাড়ি আসতে দেরি হয়েছে, আমার বন্ধুটি বাসায় এসে বসেছে। অমনি আব্বুর আক্রমণ, পড়ালেখা এবং অন্য সব নিয়ে। কথায় কথায় তিনি বললেন, "বাবা, তোমার পরীক্ষার নম্বর কেমন আসছে?"

বন্ধুটি ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, যে তার পরীক্ষা ভালো হচ্ছে না, নম্বর কম আসছে। এই যেমন গত পরীক্ষাতে মাত্র ৫৭ পেয়েছে সে!

আব্বু আমার দিকে, আমি আব্বুর দিকে– এমন এক অবস্থা হয়ে গেল। ভারতীয় বাংলা সিরিয়ালগুলোর মতোই! বাংলায় বজ্রাহত বলে একটা কথা আছে, আমার অবস্থা তখন তেমনই। আব্বু কিছু বললেন না। সন্ধ্যায় কোচিং থেকে ফিরলাম, ফিরে এসে শুরু হলো আমার উপর ঝাঁড়ির রোলার কোস্টার চালানো।

আব্বু সুন্দর করে বললেন, "বাবা, আমাদের গ্রামে হালচাষ করার লোকের একটু কমতি দেখছি। তুমি না হয় যাও, হালচাষ কর? পড়ালেখায় তো মনে হচ্ছে হবে না তোমার!"

আম্মু সাধারণত এসবে আমার পক্ষ নেয়, এবার দেখি আম্মুও আব্বুর সাথেই দুকথা শুনিয়ে দিল! সবমিলিয়ে বিশাল হতাশাজনক ব্যাপার। না, ধরা খেয়েছি সেজন্যে নয়, আসলেই কোথাও চান্স না পেলে তো মহা বিপদ! এই যে একটা ধাক্কা খেলাম, এই ধাক্কাটা পরে গিয়ে আমার অনেক কাজে লেগেছে।

সত্যি বলতে কী, এমন হতাশার পরে অনেকেই হার মানে, হাল ছেড়ে দেয়। আমি দেইনি। সব পরীক্ষায় গড়ে বিশ পেতে পেতেই একটা সময় বুঝতে পেরেছি কীভাবে ভালো করতে হবে, শেষমেষ তো আইবিএর মতো ভালো একটা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েই গেলাম!

ভর্তি যোদ্ধাদের উদ্দেশে তাই বলছি, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। ভর্তি পরীক্ষার সময়টা সবার জন্যই খুব কঠিন যায়, তাই বলে হাল ছেড়ে দিও না। আমি যদি একশতে বিশ পেয়ে ভালো কোথাও সুযোগ পেয়ে যেতে পারি, তুমি কেন নও?

অনেককেই দেখি হতাশ হয়ে যায় তাঁদের এস,এস,সি বা এইচ,এস,সির রেজাল্ট ভালো না হলে। মজার ব্যাপার কী জানো? রেজাল্ট খারাপ নিয়েও কিন্তু অনেকে চলে যায় হার্ভার্ডের মতো প্রতিষ্ঠানে! চোখ রগড়ে ওঠার মতো কথা, তাই না? সত্যিটা হলো, একাডেমিক এসব হতাশা ভুলে নিজেকে বিশ্বের জন্যে প্রস্তুত করলে বড় মঞ্চে আরো বড় সাফল্য আসবে তোমার। সে সাফল্যের স্বাদ বড় মধুর!

এবার মানসিক অশান্তিকে জানাও বিদায়

বেশ কিছুদিন আগের কথা। 10 Minute School এর তখন কোনো অফিস ছিল না। একটা ফেসবুক গ্রুপ ছিল, সেখানে সব মেম্বাররা ছিল। ওই গ্রুপেই কে কোন কাজ করবে, কি কি কাজ হবে সবকিছুর হিসেব রাখা হতো। যখন যার কোন এনাউন্সমেন্ট দেয়া লাগবে, সে তখন ফেসবুকে লাইভে গিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে দিত। এরকমই একটা লাইভ সেশনে একদিন শামির মোস্তাজিদ বিভিন্ন স্কিল শেখাচ্ছিল, সবাই গোগ্রাসে গিলছিল ওর লেসনগুলো।

লাইভ ভিডিওর একেবারে শেষদিকে ছিল আমাদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে ড়িসকাশন। এখানেও কথা বলছিল বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের হতাশার কারণগুলো। তাদের Anger, Frustration, Stress. এসব নিয়ে কথা বলতে বলতে দেখা গেল যে, কমবেশি সবারই এ সমস্যাগুলো রয়েছে।

সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো, এই মানসিক সমস্যাগুলো চলে যায় না। আমরা যতই ভুলে থাকতে চাই, এরা আরো তত বেশি জেঁকে বসে। একটা সময় পারমানেন্টলি এই সমস্যাগুলো আমাদের ভেতরে গেঁথে যায়। ডিপ্রেসড জিম্মি হয়ে ঘুরে বেড়ায় তরুণ প্রজন্ম।

আমরা চিন্তা করে দেখলাম, এর একটা সমাধান দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ, শামির বুদ্ধি দিল, এখনই আমরা একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ থ্রেড খুলে ফেলি না কেন! এই থ্রেডে আমরা প্রতিদিন তিনটা করে কাজ বা ঘটনার নাম বলব, যার জন্যে আমরা জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ। ব্যাপারটা শুনতে অবাক লাগলেও, ধীরে ধীরে দেখা গেল আমাদের সবার জীবনেই তিনটার অনেক বেশি কারণ রয়েছে বাকি জীবনভর কৃতজ্ঞ থাকার!

এতে যে ব্যাপারটা হলো, এই সুখের অভিজ্ঞতা, এই কৃতজ্ঞতার সন্ধান করতে গিয়ে সবার মনটাই ভালো হয়ে যায় আর তাতে এই যে মানসিক সমস্যাগুলো,

ডিপ্রেশন বা স্ট্রেস আর হানা দিতে পারছে না কাউকেই! রাতারাতি ডিপ্রেসড প্রজন্ম হয়ে উঠল প্রাণোচ্ছল এক প্রজন্ম, আনন্দের আর শেষ নেই!

তুমি আর তোমার বন্ধুদের মাঝেও কি এমন ডিপ্রেশন আর অন্যান্য মানসিক সমস্যা বিরাজ করছে? তোমারও কি মনে হচ্ছে এই Anxiety বা ফ্রাস্ট্রেশন এর সাথে চলতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে? তাহলে তুমিও তোমার বন্ধুদের নিয়ে শুরু করে দিতে পার এই প্রক্রিয়াটি, হাসি ফুটবেই তোমাদের মুখে! এছাড়াও আরো বেশ কিছু কাজ করতে পার এসব মানসিক সমস্যা দূর করতে, যেমন :

১. নিয়ন্ত্রিত জীবনঃ

একটি সুন্দর নিয়ন্ত্রিত জীবন থাকলে কিন্তু হতাশা ঘিরে ধরতে পারে না। নিজের জীবনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলে কাজ কর্ম করেই আসলে দিন কেটে যাবে, ডিপ্রেশন পাত্তাই পাবে না!

২. অনিদ্রাকে না বলোঃ

এটি একটি পরীক্ষিত ব্যাপার যে, বেশি রাত জাগলে সেটি মনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, জন্ম নেয় বিভিন্ন মানসিক সমস্যা। তাই রাত জাগা নিশাচর পাখি না হয়ে ঠিক সময়ে ঘুমিয়ে গেলে মন সুস্থ থাকবে, সুস্থ থাকবে দেহ। ফলশ্রুতিতে ফ্রাস্ট্রেশন দুরেই থাকবে!

৩. নৈরাশ্যবাদী হবে নাঃ

একটা গ্লাসের অর্ধেক পানি ভর্তি। গ্লাসটি সম্পর্কে একজন আশাবাদীর বক্তব্য হবে যে, গ্লাসটি অর্ধেক ভর্তি। আর একজন নৈরাশ্যবাদী বলবে, গ্লাসের অর্ধেক খালি। তুমি অবশ্যই নৈরাশ্যবাদী হবে না। কারণ নিরাশা একবার যদি নিজেকে ভর করে তাহলে অন্যান্য মানসিক সমস্যাগুলো এসে জুড়বে সাথে সাথে।

৪. নিজেকে ব্যস্ত রাখোঃ

Procrastination বা অকারণে সময় নষ্ট করাটা এই প্রজন্মের জন্যে ব্যাধি হয়ে দাড়িয়েছে। কোনো কাজ না করে সময় নষ্ট করার পরপরই একটা সময় নিজের মধ্যে হতাশা কাজ করে। মনে হয় জীবন নিয়ে কী করলাম

আমি? এখান থেকেই নানান মানসিক সমস্যা এসে যোগ দেয়। তাই নিজেকে সবসময় কিছু না কিছু করে ব্যস্ত রাখতে হয় তবেই না রক্ষা মিলবে এসব সমস্যা থেকে। নতুন কিছু করার চেষ্টা কর, নতুন নতুন আইডিয়ার জন্ম দিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখো।

তুমি নিজেই কিন্তু নিজের হতাশাকে সাফল্যে রূপান্তর করতে পার, দরকার কেবল একটু নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ আর আত্মবিশ্বাস।

একটি ভিডিও বাঁচাতে পারে লক্ষ প্রাণ!

কিছুদিন আগে কানাডায় একটা স্টুডেন্ট কনফারেন্সে গিয়েছিলাম। সেখানে বক্তৃতা দিয়েছিল এক ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক। হাস্যোচ্ছল মানুষ, তার সাথে একটা সেলফি তোলার সুযোগও হয়েছিল। সে হলো আমরা যাকে বলি ইন্টারনেট সেলিব্রেটি। সেসব অনেক দিন আগের কথা।

এইতো সেদিন একটা ভিডিও ইন্টানেটে খুব বেশি ভাইরাল হলো, সোমালিয়াকে নিয়ে ভিডিও। দেখেই মনে হলো, 'আরে! এ তো জেরোম জার!' খুব আগ্রহী হয়ে শুরু করলাম ভিডিওটি দেখা। দেখে মনে মনে তাকে একটা স্যালুট জানালাম, অসাধারণ কাজ করেছেন তিনি! সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় যে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলা যায়, সেকথা এখন আর পুরনো নয়। কিন্তু জেরোম জার এবং আরো অনেকেই এই মাধ্যমটির সহায়তাকে নিয়ে গেছেন একেবারে অন্য এক মাত্রায়। জেরোমের গল্প বলি:

১. সোমালিয়ার কান্না:

সোমালিয়ার নাম আমরা শুনেছি দুর্ভিক্ষপীড়িত আফ্রিকান একটি দেশ হিসেবে, গৃহযুদ্ধ আর অপ-রাজনীতির চাপে যে দেশটির মানুষগুলোর জীবন দুর্বিষহ। এ মুহূর্তে সেখানে একটা দুর্ভিক্ষ চলছে, আর দেশটার অর্ধেকের বেশি মানুষ সেখানে না খেয়ে আছে। ভয়ানক অবস্থা। কিছুদিন আগে একটা ছোট বাচ্চা পানির অভাবে মরে গেছে, আর এই খবরটা জেরোমের কানে এসেছিল।

একজন সাদা মনের মানুষ জেরোম তখন গুগল করতে শুরু করলো, কীভাবে এমন ভয়ানক দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচানো যায় সোমালিয়ার নিরীহ মানুষগুলোকে? অবাক হয়ে জেরোম আবিষ্কার করল যে, সাহায্য তো অনেক দূরের কথা, দেশটিতে বিমানব্যবস্থা বলতে মাত্র একটি এয়ারলাইন্স! Turkish Airlines নামে সেই এয়ারলাইন্সকে কেন্দ্র করে তাই জেরোম জার প্ল্যান করলেন সোমালিয়াকে বাঁচানোর।

বিশ্ব কাঁপানো এক ভিডিওঃ যেই ভাবা সেই কাজ, জেরোম তখনই একটা ভিডিও বানিয়ে ফেললো। ভিডিওর শেষে দিল একটা হ্যাশট্যাগ, অদ্ভুত ব্যাপার, এই এক হ্যাশট্যাগই বদলে দিল অনেক কিছু। তার পাশাপাশি অন্যান্য সেলিব্রিটিরাও শেয়ার দিল এই ভিডিওটি, তারাও শুরু করল এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে সোমালিয়াকে বাঁচানোর আকুতি।

২. রাজি হলো সবাইঃ

অবাক কান্ড, ব্যাপারটা টার্কিশ এয়ারলাইন্সের কান পর্যন্ত গেল। তারা জেরোম জারের সাথে কথা বলল, এবং খুশিমনে রাজি হলো তাদের একটি কার্গো বিমান যেটা সোমালিয়াতে যায়, পুরোপুরি কার্গো ফ্রি করে জেরোমদের দিতে। কার্গোর ধারণক্ষমতা ছিল ৬০ টন। পুরোপুরি ফাঁকা এই কার্গো বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী আর খাবার নিয়ে ভর্তি করতে আবার দরকার প্রচুর টাকা। সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে?

৩. জেরোমের আরেক উদ্যোগঃ

জেরোম বানিয়ে ফেলল আরেকটা ভিডিও। এখানে সে পুরো বিশ্বকে দেখালো যে, ৬০ টন কার্গো ফাঁকা রয়েছে, এখন মানুষের সাহায্যই পারে এই কার্গোটি ভর্তি করতে। সে এবং তার এই Campaign এর সবাই মিলে তাই শুরু করল Crowd funding, যেখান থেকে টাকা উঠলেই কার্গোর জন্যে সবকিছু কেনা যাবে।

৪. সাফল্যঃ

তাদের লক্ষ্য ছিল এক মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠন এবং পনেরো দিনে যেন সেটি তুলে ফেলা যায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তিন দিনেই জেরোম ও তার ক্যাম্পেইন তুলে ফেলল দু মিলিয়ন ডলার বা ১৬ কোটি টাকা! পুরো টাকাটা দিয়ে প্রচুর রিলিফ কেনা হলো, শুকনো খাবার কেনা হলো। এক কার্গোর আইডিয়াতেই দুর্ভিক্ষের কষ্টের অনেকটা উপশম হলো সোমালিয়ার দরিদ্র সেসব মানুষের।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি এখনো ফোনে আমার সাথে জেরোমের সেই সেলফি দেখছি, আর জেরোম সেই ফোন আর একটা ক্যামেরার সাহায্যে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলছে! অবাক হতেই হয়!

আমরা সবাই হয়তো জেরোমের মতো ইন্টারনেট সেলিব্রেটি নই। আমাদের ফেসবুক পোস্ট, ইন্সটাগ্রামের ছবি হয়তো তেমন শেয়ার হয় না। কিন্তু সবাই মিলে যদি এগিয়ে আসি যেকোনো সামাজিক সমস্যার পরিবর্তনে, তাহলেই কিন্তু বিপ্লব আনতে পারি আমরাও, সেটিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যেই!

দোষটা কি আসলে তেলাপোকার?

গুগলের নতুন সিইও সুন্দর পিচাই। অসম্ভব গুণি এই মানুষটির একটি গল্প খুব জনপ্রিয় হয়েছিল কিছুদিন আগে। গল্পটি বলতে গেলে অনেকের ধারণাই পালটে দিয়েছিল নিজের জীবন সম্পর্কে! অথচ গল্পটি ছিল ছোট্ট একটি তেলাপোকাকে নিয়ে।

সুন্দর পিচাইয়ের অভ্যেস প্রতিদিন সকালে একটা নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে বসে সকালের নাস্তা করা। যেখানে বসে কফির কাপটা হাতে নিয়ে চারপাশের মানুষগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে তার বড় ভালো লাগে। কোনো এক সকালে পিচাই যথারীতি সেই রেস্টুরেন্টে এসে বসেছেন। তার ঠিক পাশের টেবিলেই দুজন ভদ্রমহিলা বসেছেন। সকাল বেলা, রেস্টুরেন্ট বেশ জমজমাট।

এমন সময় হলো কি, কোত্থেকে একটা তেলাপোকা উড়ে এসে ঠিক সুন্দর পিচাইয়ের পাশের টেবিল, মানে ওই ভদ্রমহিলাদের টেবিলে বসল। ভদ্রমহিলা দুজন তো রীতিমতো লঙ্কাকান্ড বাধিয়ে ফেললেন। চিৎকার চেঁচামেচি করে সে এক ভয়ানক অবস্থা! ছোট্ট তেলাপোকা, সে এই শোরগোলের মধ্যে ভয় পেয়ে দিল এক উড়াল।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক ওয়েটার। হাত ভর্তি গরম খাবার। একটুখানি এদিক সেদিক হলেই খাবারসহ পড়ে যেতে হবে তাকে। তেলাপোকা উড়ে এসে সেই ওয়েটারটির কাঁধে এসেই বসল। ততক্ষণে ভদ্রমহিলাদ্বয়ের চিৎকারে পুরো রেস্টুরেন্টের নজর ওই তেলাপোকার দিকে। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওয়েটার কী করে দেখার জন্যে।

ওয়েটার করলেন কি, খুব শান্তভাবে তার হাতের খাবার পাশের টেবিলে রাখলেন। তারপর আরো শান্ত ভঙ্গিতে এক টোকায় তেলাপোকাটাকে কাঁধ থেকে পুরো রেস্টুরেন্টের বাইরেই ছুঁড়ে ফেরে দিলেন! তার পরের মুহূর্তেই সে আবার খাবার পরিবেশন শুরু করলো, যেন কিছুই হয়নি এতক্ষণ!

ব্যাপারটাতে সবাই বেশ মজা পেলেও সুন্দর পিচাইয়ের মনে তখন আরো গভীর একটা বিষয় চলছে। তার মনে হলো, ভদ্রমহিলাগুলোর চিৎকারে কোনো লাভ তো হয়ইনি, তাতে অহেতুক গোলযোগ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ঠান্ডা মাথায় ওয়েটারের দারুণ সিদ্ধান্তে ব্যাপারটা আর কোনোরকম ঝামেলায় গড়ায়নি!

পিচাইয়ের মনে হলো, আমাদের জীবনটাও কিন্তু এরকমই! যেকোনো সিচুয়েশনে আমরা যদি অকারনে React করি তাহলে ব্যাপারটা আরো খারাপের দিকে গড়াবে। কিন্তু সেখানে যদি আমরা Respond করি, তাহলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে যাবে! ছোট্ট দুটি শব্দ React আর Respond, কিন্তু দুটির পার্থক্য পুরো ঘটনাকেই পালটে দেয়।

এক তেলাপোকার গল্প থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের সমাজে নতুন কিছু করতে গেলে, নিজের মত চলতে গেলে অনেকে অনেক কিছুই বলে। মানুষের সমালোচনার কোনো শেষ নেই, সমালোচনা চলতেই থাকে। তুমি যেভাবেই থাকো না কেন, সমাজের কেউ না কেউ সেটি নিয়ে একটু হলেও ভ্রূকুটি করবেই! এটা বলতে গেলে একটা রীতি হয়ে গেছে আমাদের সমাজের।

এই সমালোচনা, তিরস্কার, ভ্রূকুটি এগুলো হচ্ছে ওই তেলাপোকাটার মতো। এরা যেকোনো জায়গা থেকে কোনো না কোনোভাবে উঠে আসবেই! কিন্তু তুমি নিজেকে ওয়েটারের জায়গায় দেখবে, নাকি ওই ভদ্রমহিলার জায়গায় এটিই বদলে দেবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি। ভদ্রমহিলা দুজন ভয় পেয়েছেন, অহেতুক চিৎকার করে লোকসমাগম করেছেন। তাতে কিন্তু তাদের খুব সম্মান বৃদ্ধি পায়নি!

আমাদের জীবনে আমরা এই ভদ্রমহিলাদ্বয়ের মত ভয় পেলে তাতে সমালোচনা আমাদের পেয়ে বসবে। আমাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে যে আমরা অকর্মা, কোনো কাজ পারি না, আমাদের দিয়ে কিচ্ছুটি হবে না। তাতে ক্ষতি বৈ লাভ কিছু হচ্ছে না।

অন্যদিকে তুমি যদি ওয়েটারের জায়গায় নিজেকে দেখ, ঠান্ডা মাথায় যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত থাকো, তাহলেই কিন্তু জীবনটা অনেক সুন্দর আর সহজ হয়ে ওঠে। ওয়েটার যেমন শান্ত হয়ে এক টোকায় সব সমস্যার সমাধান করেছেন, তোমরাও তেমনি সমালোচনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে এগিয়ে গেলে সাফল্য আসবেই! এতে যেটা হবে, তোমার আত্মবিশ্বাস থাকবে পরিপূর্ণ, পরের কাজগুলোতে আরো সাহস করে আরো ভালো কাজ করতে পারবে! দারুণ হবে না সে ব্যাপারটা?

সুন্দর পিচাইয়ের গল্পটা এজন্যেই বলা যে, আমাদের জীবনের বড় একটা অংশ জুড়ে আছে সমালোচনা আর তিরস্কার। এসবের ভারে নুয়ে না পড়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে আপন আত্মবিশ্বাসে। তবেই না লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারবে তোমরা!

গোলাপি হাতি থেকে রক্ষা পাওয়ার রহস্য

আমার এক স্যার একদিন আমার উপর ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করেন। তিনি আমাকে বলেন, "আয়মান, তুমি একটা কাজ কর। চোখ বন্ধ করে যেকোনো কিছু নিয়ে চিন্তা কর।" আমার তখন সামনে পরীক্ষা, সেটি নিয়ে মহা দুশ্চিন্তা মাথায় ঘুরঘুর করছে। আমি পরীক্ষা নিয়েই ভাবতে শুরু করলাম। খানিক বাদে স্যার আবার বলে বললেন, "কিন্তু আয়মান, একটা নিয়ম আছে। তুমি যা কিছু নিয়েই ভাবো, গোলাপি হাতি নিয়ে চিন্তা করাই যাবে না।"

কিছুক্ষণ পরে স্যার চোখ খুলতে বললেন। আমি একরাশ স্বস্তি নিয়ে চোখ খুলতেই স্যারের প্রশ্ন :
"তাহলে একবার বল, এতক্ষণ কী নিয়ে চিন্তা করলে?"
আমাকে বলতেই হলো যে, স্যার ওই গোলাপি হাতির নিয়মটা বলার পর থেকে মাথায় শুধু গোলাপি হাতিই ঘুরছে, এমনকি চোখ খোলার পরেও!
স্যার মৃদু হেসে বললেন, "এরকমই হয়। এটাকে বলা হয় Pink Elephant Syndrome.

আমরা সবসময় সেটা নিয়েই ভাবি যেটা করতে মানা করা হয় আমাদের। এজন্যেই তোমাকে যদি কেউ বলে, দুঃখ করো না, তখন মনের মধ্যে দুঃখ আরো বেড়ে যায়!"

স্যারের কথা শুনে আমার মনে হলো, আসলেই তো! স্যারের কথা কিন্তু একশো ভাগ সত্য! এরকম তো আমার সাথেও অনেক হয়! আমি যদি খুব ডিপ্রেসড থাকি, তখন যদি কেউ এসে বলে দোস্ত ডিপ্রেসড থাকিস না, প্রেসার নিস না, তখন কিন্তু আমার আরো বেশি খারাপ লাগে। বিষয়টা সেভাবে দেখলে আসলে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মানুষগুলো কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেয়!

এতোকিছু ভাবার পর মাথায় আরেকটা বিষয় এলো যে এ সমস্যাটা থেকে আমাদের যে দুশ্চিন্তা, ফ্রাস্ট্রেশন আরো বেড়ে যায়, তার কি কোনো সমাধান

নেই? ভাবতে ভাবতেই মনে হলো এরও একটা সমাধান আছে। আমার এমনটা হলে সে সমাধানটাই আমি কাজে লাগাতাম!

এমন একটা সমস্যা থেকে রেহাই পেতে হলে আসলে আমাদের এগোতে হবে ধাপে ধাপে। কয়েকটি ধাপে চেষ্টা করলে কিন্তু এই গোলাপি হাতির কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। চলো জেনে নিই এ ধাপগুলো:

ধাপ-১

প্রথমেই চিন্তা করতে হবে, আসলে সমস্যাটা কী? তুমি যদি ডিপ্রেসড থাকো, যদি হতাশা তোমাকে ঘিরে থাকে, তাহলে সেসবকে দূর করার পরিবর্তে সেগুলো নিয়েই কাজ করে যাবার চেষ্টা করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের সমস্যা জীবনে থাকবেই, এগুলো নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে। কিন্তু শুধুমাত্র এসব নিয়ে চললেও কিন্তু হবে না আবার!

ধাপ-২

সমস্যাটা চিহ্নিত করার পর সেটি নিয়ে ভাবা যাবে না। সমস্যা কীভাবে দূর করব, সমস্যা আমার কী ক্ষতি করবে এসব নিয়ে ভাবতে থাকলে যত দিন যাবে তোমার চারপাশ ঘিরে শুধু সেই সমস্যাকেই দেখতে পাবে, আর কিছুর দেখা পাবে না। তাই সমস্যা নিয়ে না ভেবে "সমস্যা সমস্যার জায়গায় আমি আমার জায়গায়" মনে করে কাজ করে যেতে হবে।

ধাপ-৩

নতুন কোনো কাজে লেগে পড়তে হবে। কাজ বলতে কাগজ কলম পিষে অফিসের কাজ করতে হবে, তা কিন্তু নয়। নতুন কাজ হতে পারে যেমন খেলাধুলা করা, নতুন কোনো একটা গল্পের বই পড়া কোনো একটা মুভি দেখা। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে, আর সেজন্যেই এসব করার দরকার। এগুলো ছাড়াও তোমার পছন্দের যেকোনো কাজ করেও তুমি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পার।

ধাপ-৪

নিজেকে যখন ব্যস্ত রাখতে শুরু করেছ, তখন দেখবে ধীরে ধীরে তোমার দুশ্চিন্তা, হতাশা এরকম সমস্যাগুলো আর তোমার কর্মব্যস্ততার সাথে পেরে

উঠছে না। আর পারবেই বা কেন? তুমি তো মহাব্যস্ত তোমার কাজগুলো নিয়ে! এখন তোমাকে তুলনামূলক দরকারি কাজ শুরু করতে হবে। পড়ালেখা এবং তোমার নিজের জন্যে দরকারি সব কাজ শুরু করে দিতে হবে এখনই!

ধাপ-৫

নিজেকে ব্যস্ত রাখলে তুমি, পাশাপাশি নিজের জন্যে একটু সময়ও বের করে ফেলেছ তুমি। আর কী লাগে? এই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করলেই দেখবে তোমার এই যে দুশ্চিন্তা আর হতাশা সব চলে গেছে! কাজের চাপে তুমি সেটা টেরও পাওনি! এখন নিজের মত করে চলতে শুরু করবে তুমি আবার যদি কোনোদিন হতাশায় পড়ো, জানোই তো কি করতে হবে! সোজা ধাপ ১ এর চলে গেলেই কেল্লাফতে!

মন খারাপ, হতাশা, দুশ্চিন্তা, এসব আমাদের মানসিক ব্যাপার। এগুলোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। তাই এগুলো নিয়েই নতুন কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে দেখা যাবে সব সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়।

পৃথিবীর সবথেকে ভালো আইডিয়াগুলো কোথায় পাওয়া যায়?

যদি প্রশ্ন করি, পৃথিবীর সবথেকে ভালো আইডিয়াগুলো কোথা থেকে আসে? অনেক রকমের উত্তর আসবে। কেউ বলবে বাথরুম থেকে, কেউ বলবে অবসর সময় থেকে, কেউ আবার ঠাট্টার ছলে বলবে বিয়ে করলে মাথায় অনেক ভালো আইডিয়া আসে! এমন অনেক রকম উত্তরের মেলায় সঠিক উত্তরটি কি জানো? পৃথিবীর সবথেকে ভালো আইডিয়াগুলো আসে কবরস্থান থেকে। শুনে খুব অবাক হচ্ছো তাই না?

একটা ভিডিওতে দেখলাম এটাই বলা হয়েছে। যুক্তিটাও বেশ চমৎকার। আমাদের মাথায় দারুণ দারুণ সব আইডিয়া আসতে থাকে প্রায়ই। এই আইডিয়াগুলোর প্রায় সবগুলোই আমরা একটা সময়ে ভুলে যাই। যেগুলো ভুলি না, সেগুলোর কিন্তু প্রয়োগও করা হয় না বেশিরভাগ সময়েই। সব আইডিয়া এসে জমে মাথায়, আর এতো শত আইডিয়া মাথায় নিয়ে আমরা এক সময়ে মরে যাই। আমাদের সাথে সাথে আইডিয়াটাও কবরে চলে যায়। এজন্যেই বলা হয়েছে, সবথেকে ভালো আইডিয়াগুলোর সন্ধান মেলে কবরেই!

এর কারণটা কি জানো? কারণ হলো আমাদের দ্বিধা। ধরো, তোমার একটা ফাটাফাটি আইডিয়া আছে মাথায়। তুমি এমন একটা প্রজেক্টের প্লান করলে, যেটা পুরো ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম কমিয়ে দেবে সহজেই! আইডিয়া সুন্দর, চেষ্টা করলে হয়তো এগিয়ে যেতে পারবে তুমি প্লান নিয়ে। এসময়ে বাগড়া দেয় দ্বিধা। তোমার মধ্যে কনফিউশন শুরু হয়ে যায়—পারবে তো ঠিকমত সব কাজ করতে? ভুল হবে না তো? অর্থায়ন করতে সমস্যা হবে কি?

এতো শত দ্বিধা আর "আমি কি পারবো ?" এমন প্রশ্নের ভীড়ে এক সময় কাজের আগ্রহটাই চলে যায়। তোমার দ্বিধাই জয়ী হয়, সেই প্রজেক্টে ধুলো জন্মে। একসময় সেটা আর কোনো কাজেই আসে না, তোমার প্লান তোমার মনেই রয়ে যায়। একটা সময়ে ওই ভিডিওর মতোই তোমার স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায় তোমার সাথেই।

ওয়ারেন বাফেট একটা কথা বলেছিলেন, “We don't see our lost opportunities, as we see our failures.” সোজা একটা কথা, কিন্তু এর অর্থ অনেক গভীর। তুমি যখন কোনো কাজে ব্যর্থ হও, তখন তোমার চোখে পড়ে সেই ব্যর্থতাটাই। সেখানে তোমার ফোকাস রেখে তুমি সিদ্ধান্ত নাও, তাই ওই ব্যর্থতাকে ফলাফল ভেবে তুমি আর সেই কাজে এগোতে চাও না। একবার ভেবে দেখ তো, তুমি যদি ওই ব্যর্থতার দিকে চোখ না দিয়ে, যে সুযোগটা হাতছাড়া হতে পারে সেদিকে চোখ দাও, তাহলে কিন্তু তোমার ওই কাজটা করার প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে!

ব্যর্থতা আসতেই পারে, হতাশ হতেই পার তুমি। কিন্তু তাই বলে যদি হাল ছেড়ে দাও, তাহলে যে সুযোগটা হাতছাড়া হতে যাচ্ছে, সেই সুযোগ আবার পাবে কি তুমি? এটুকু ভেবেও কিন্তু এগিয়ে যেতে পার তুমি, সাফল্য আসতে বেশি দেরি হবে না!
আইডিয়া সবার মাথায় আসে না, তাই তোমার আইডিয়াগুলো হারিয়ে গেলে সেগুলো আরেকজনের মাথা থেকে আসবে, সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই। নতুন পৃথিবী খুব প্রতিযোগিতামূলক, এখানে তোমার একটা ভালো আইডিয়া তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অন্যদের থেকে। আইডিয়াগুলোকে তাই হারিয়ে যেতে দিও না।

তোমার জীবনে ব্যর্থতা আসতেই পারে। টেন মিনিট স্কুল শুরু করার সময় হাজারটা ব্যর্থতা এসে জুড়েছিল আমাদের সাথে। সব সমস্যার সমাধান হয়েছে, আমরা একবারও হাল ছাড়িনি। আর হাল না ছাড়ার পর একটা সময়ে টেন মিনিট স্কুল এখনকার অবস্থায় এসেছে, পরিচিতি পেয়েছে। আমাদের আইডিয়াগুলো যদি আমরা এভাবে কাজে না লাগাতাম, তাহলে হয়তো টেন মিনিট স্কুলও পড়ে থাকত কোনো খসড়া খাতায়। তা হয়নি, কারণ, হাল ছাড়েনি টেন মিনিট স্কুল টিম।

তোমাদের তাই বারবার একটা কথাই বলব, হাল ছেড় না। আইডিয়াগুলোকে হারিয়ে যেতে দিও না। নিজের স্বপ্নকে ফলো কর, সাফল্য দেখা দেবেই!

সুন্দর মানসিকতা গড়ে তোলার ৬টি উপায়

Great minds talk about ideas; average minds talk about events; small minds talk about people.

এই উক্তিটা প্রথম যেদিন শুনেছিলাম, মনে হয়েছিল কেউ যেন সপাটে একটা চড় মেরেছে আমাকে। নিজের কাছেই মনে হয়েছিল, আমিও তো প্রায়ই মানুষকে নিয়ে একথা সেকথা বলি, সমালোচনা করি। ব্যাপারটা বেশ খারাপ লেগেছিল তখন। আমার বন্ধু শামিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে এমনটা আসলে কেন হচ্ছে আমাদের সাথে? সবজান্তা শামিরের উত্তর ছিল, যে আমরা আসলে নিজেদের সামর্থ্য নিয়ে প্রায়ই সংশয়ে থাকি, নিজের আত্মবিশ্বাসটা থাকে না। এইজন্যেই অন্য কারো নামে খারাপ কিছু বললে বা সমালোচনা করলে এক ধরনের আত্মতুষ্টি পাওয়া যায় আর কী।

ভেবে দেখলাম, কথা কিন্তু মিথ্যা না। ছোটবেলায় যখন মা এসে বলতো, স্কুলে ফার্স্ট হতে পারিস না কেন? তখন আমার অজুহাত তৈরিই থাকতো, যে ফার্স্ট বয়ের অনেক টিচার, তার আসলে ব্রেইন নেই, টিচারের জোরে ফার্স্ট হয়। কলেজ বা স্কুলে কো-কারিকুলার কোনো কাজে কেউ ভালো করলে আমরা বলতাম, ও তো পড়াশোনায় অনেক বাজে, এজন্যে ডিবেট করে নাম কুড়াচ্ছে। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কম্পিটিশনে যখন কোনো প্রাইজই আনতে পারছিলাম না, তখন বন্ধুদের বলতাম, "আরে দোস্ত, আমার আইডিয়াটা সবচেয়ে বেশি ব্রিলিয়ান্ট ছিল, জাজগুলো সেটা বুঝতেই পারলো না!"

আসলে ব্যাপারটা সত্যি। আমরা অন্যদের ব্যাপারে খারাপ কথা, সমালোচনা করে নিজের দোষগুলোকে, নিজের অপ্রাপ্তিগুলোকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করি। তাই Great Mind তো পরের কথা, অন্তত Small Mind যাতে আর না হতে হয়, সে চেষ্টা টা তো করাই যায়। সমস্যা হলো, অন্যদের নিয়ে কথা বলাটা আমাদের একরকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কী করে রক্ষা পাওয়া যায় এমন অভ্যাস থেকে? এই প্রশ্নের কয়েকটি সমাধান রয়েছে।

১. সংকীর্ণমনা হবে নাঃ

নিজের মনকে ছোট্ট খাঁচায় বন্দি করে রাখা যাবে না। শুধুমাত্র শোনা খবরে বিশ্বাস করতে হবে, এমনকোনো কথা নেই কিন্তু! তথ্যের এই যুগে চেষ্টা করো নিজেকে ছড়িয়ে দেয়ার, যতোটা পার তথ্য জেনে নেবার। এতে যেমন তোমার জ্ঞান বাড়বে, তেমনি বিবেকবোধ আরো উন্নত হবে, অন্য মানুষকে নিয়ে কথা বলবার ইচ্ছটাই থাকবে না!

২. গসিপ থেকে দূরে থাকোঃ

মানুষ তোমাকে নিয়ে গসিপ করতেই পারে, তোমার পেছনে তোমার নামে আজেবাজে কথা ছড়াতে পারে। তার মানে এই নয় তুমিও তাদের নিয়ে গসিপ করা শুরু করবে। তাহলে ওদের সাথে তোমার পার্থক্য থাকলো কোথায়?

৩. মানুষ নয়, সমস্যার দিকে ফোকাস করোঃ

তোমার অফিসের বস কিংবা সহকর্মী কিংবা স্কুলের সহপাঠি কোনো কাজে ভুল করলে বা সমস্যা সৃষ্টি করলে তাদের সমালোচনা না করে সমস্যার দিকে নজর দাও। মানুষ ভুল করতেই পারে, অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাদের দোষ না দিয়ে সবার আগে সমস্যার সমাধানের দিকে ফোকাস করো।

৪. শুধু নিজেকে নয় বিশ্বকে নিয়ে ভাবোঃ

বর্তমান বিশ্ব কিন্তু খুব সুখে নেই। বিভিন্ন রকম দূষণ, দেশে দেশে যুদ্ধ, জঙ্গিবাদ থেকে শুরু করে নানা সমস্যায় পৃথিবী এখন জর্জরিত। তাই আশেপাশের মানুষদের সমালোচনায় তোমার সময় নষ্ট না করে শুরু করো বিশ্বকে জানার, বিশ্বের সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করার। কারণ পরোক্ষভাবে হলেও বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর প্রভাব তোমার উপরেও পড়বে!

৫. নিজের ইচ্ছেমতো হুট করে সিদ্ধান্ত নেবে নাঃ

কোনো ঘটনা ঘটলে সেটি নিয়ে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে চলে আসবে না। আগে ভাবতে থাকো কি বিষয়ক সমস্যা, এই নিয়ে বাকিদের কি মতামত। কেনো এই সমস্যা বা ঘটনাটি ঘটেছে, এবং এই নিয়ে কি করা যায় সমাধান হিসেবে। ঘটনার একদম মূলে চলে যাও, তবেই সত্যের সন্ধান পাবে।

৬. শুধু সমস্যা নয় সমাধানের দিকে তাকাও:

আমাদের বড় একটা সমস্যা হলো কোনো বিপদ বা সংশয়ে আমরা সমাধান না খুঁজে একজন আরেকজনের দোষ খুঁজতে থাকি। এটাই আসলে আমাদের হিসেবে আরো বেশি প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। এজন্যে যেকোনো সমস্যায় সমাধানের দিকে ফোকাস করা খুবই দরকারি। সমাধানের খোঁজ বের হলে কিন্তু আর মনের মধ্যে খচ খচ করবে না কার দোষ এটা খুঁজে বের করতে! আর এই সমাধান বা আইডিয়াই তোমাকে Great Mind হতে সাহায্য করবে।

তুমি চাইলেই নিজেকে Poor Mind থেকে Great Mind এ পরিণত করতে পার, দরকার শুধু একটু চেষ্টা আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কথায় বলে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলালেই বদলে যায় জীবন, তাই তুমিও বদলে যাও, হয়ে যাও একজন Great Mind এর মানুষ!

সিজিপিএ আসলে কতটা প্রয়োজন?

সিজিপিএ হচ্ছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার একাডেমিক সাফল্যের প্রমাণ। সিজিপিএর অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমরা যখন এসএসসি দিয়ে কলেজে ওঠার ভর্তিযুদ্ধে প্রবেশ করি, তখন ভালো কলেজ পেতে হলে কিন্তু এসএসসির রেজাল্টটাই দেখা হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময় সেই এইচএসসির নম্বরটাও কিন্তু যোগ করা হয় ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের সাথে, আর সেটা বড় একটা ভূমিকা রাখে নম্বরে। ঠিক একইভাবে তোমার প্রথম জবে সিজিপিএ-ও ভালোই ভূমিকা রাখবে। কারণ যারা জব দেবে, তারা তোমাকে চেনে না, জানে না তোমার প্রতিভা আর কৃতিত্বের কথা। তারা তখন তোমার সিজিপিএ দিয়েই তোমাকে মূল্যায়ন করবেন। প্রথমবারের এই ঝক্কিঝামেলার পর থেকে পরের সব জবে তোমার অভিজ্ঞতা আর কর্মক্ষমতাই তোমার হয়ে কথা বলবে। এ বিষয়ে চলো আরো কিছু আলোচনা করি-

১. সিজিপিএ বনাম অন্যান্যঃ

চাকরির শুরু তেই সিজিপিএর এমন দরকার দেখে অনেকেই হয়তো মনে করছো, তাহলে কি সিজিপিএই সব? অন্যান্য কাজ, এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটি, এতশত ক্লাবে কাজ করা কি বৃথা? আসলে কিন্তু মোটেও তা নয়। হ্যাঁ ভালো একটা জব পেতে হলে সিজিপিএটা দরকার, কিন্তু তার পাশাপাশি দরকার হয় অভিজ্ঞতারও। ভালো সিজিপিএ আছে অনেকেরই, কিন্তু কোন ইভেন্টে কাজ করার অভিজ্ঞতা, কিংবা হঠাৎ করে কোনো অবস্থা সামলাতে পারার ক্ষমতা আছে ক'জনের?

সিজিপিএ'র পেছনে ছোটার পাশাপাশি এগুলো করলেও কিন্তু তুমি এগিয়ে থাকতে পার অন্য সকলের থেকে। একটা রুমে যদি দুজন ক্যান্ডিডেট থাকে, যাদের একজনের অনেক ভালো সিজিপিএ কিন্তু বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই আর অন্যজনের মোটামুটি ভালো সিজিপিএর সাথে আছে অভিজ্ঞতার

ঝুলি, দ্বিতীয়জনের দিকেই কিন্তু জবের পাল্লাটা ঘুরে যায়। তাই অন্য সবার থেকে তোমাকে এগিয়ে রাখতে দরকার একটুখানি অভিজ্ঞতার ঝলক!

কিন্তু কী করলে অর্জন করা যাবে এসব অভিজ্ঞতা? কীভাবে অভিজ্ঞতার বলে এগিয়ে থাকা যাবে বাকিদের থেকে? এর জন্যে আসলে কোনো শর্টকাট নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম বছরটায় কিন্তু পড়ালেখা কিছুটা শিথিলভাবে চলে। এটাই হচ্ছে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে সেরা সময়। শিথিলতাটাকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছুই করে ফেলতে পার তোমরা। যেমন :

২. এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটি:

বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার বছরগুলি কেটে যাবে একের পর এক অনুষ্ঠান আর আয়োজনে। তুমি গান গাইতে পার? তোমারই সুযোগ নিজের পরিচিতি বাড়ানোর এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে। তুমি নাচতে বা অভিনয় করতে পার? অন্যান্য প্রতিভা আছে তোমার? সেগুলো দেখিয়ে দেবার শ্রেষ্ঠ সময় এটিই। শুধু বাসায় বসে পড়াশোনা না করে এমন প্রতিভার বিকাশ তোমার অভিজ্ঞতা আর পরিচিতি বাড়াতে সাহায্য করবে। তাছাড়া লেখালেখির অভ্যেস থাকলে সেটাও কাজে লাগাতে পার তুমি। আমাদের ১০ মিনিট স্কুল এর ইমেইলে লেখা দিয়ে তুমি হয়ে যেতে পার আমাদের বস্নগের একটা অংশ!

৩. প্রতিযোগিতা:

ক্লাম্পাসে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিতর্ক ভালোবাসলে আছে নানা বিতর্ক প্রতিযোগিতা। আছে বিজনেস কম্পিটিশন, যেখানে ভালো করলে বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ থাকে, সুযোগ থাকে পড়ালেখার পাট চুকিয়ে সেখানে চাকরি করারও! আরও আছে MUN, যাকে এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা বললে একটুও ভুল হবে না! MUN এ ভালো করতে পারলে সেটি নিঃসন্দেহে তোমার সিভিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে থাকবে!

৪. ক্লাব:

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম ক্লাব থাকে। ডিবেট ক্লাব, কালচারাল ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব আরো কত কি? তুমিও যোগ দিতে পার এসব ক্লাবে।

ক্লাবগুলো থেকে বিভিন্ন দিবসে ইভেন্ট আয়োজন করা হয় সেগুলোয় অংশ নিয়ে কিংবা ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেও তুমি অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পার! পড়ালেখার ফাঁকে ভিন্ন কিছু করলে মন্দ হয় না কিন্তু!

৫. পার্ট টাইম জবঃ

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে পার্ট টাইম জব অসাধারণ একটি মাধ্যম। এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে যারা পার্ট টাইম জবের সুযোগ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের। এদের মধ্যে কোনো কোনোটা অবৈতনিক, আবার কোনোটা থেকে উপার্জন করাও সম্ভব। নিজে টাকা উপার্জন করলে কেমন একটা আনন্দ হয় না? তার সাথে যদি যোগ হয় অফুরন্ত অভিজ্ঞতা, ব্যাপারটা তখন সোনায় সোহাগা হয়ে দাঁড়ায়!

৬. ইন্টার্নশিপঃ

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করার স্বপ্ন দেখাটাও অনেকটা দুঃসাহসের মতো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমন কোম্পানিতেও তোমরা কাজ করতে পরো ইন্টার্ন হিসেবে! এমন সব কোম্পানিগুলো প্রায়ই ইন্টার্ন চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয় খবরের কাগজে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে এমন কোনো কোম্পানির ইন্টার্ন হতে পারলে তুমিও পাবে সেই অভিজ্ঞতা আর সিভিতে যোগ হবে আরেকটি শক্তিশালী কৃতিত্ব!

৭. ভার্চুয়াল সুপারহিরোঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে থাকতেই তুমি শিখে ফেলতে পারো পাওয়ার পয়েন্ট আর ডিজাইনিং নিয়ে নানা কিছু! শিখে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারলে সেটি তোমার স্কিলের একটি অংশ হয়ে যাবে। সোশ্যাল মিডিয়া কাজে লাগিয়ে তুমি শুরু করতে পার ইউটিউবিং আর সেগুলো প্রয়োগ করে হয়ে উঠতে পার অভিজ্ঞ আর পরিচিত!

এতকিছু বলার কারণ হচ্ছে যে, সিজিপিএই সব এ ধারণা দূর করতে পারলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে। আজ আমরা চাই সবাই সিজিপিএ'র পাশাপাশি অন্যান্য কাজও করবে, তাহলে তোমাদের জীবন হবে আরো রঙ্গিন। কীভাবে করতে হবে সেটা? উত্তর একটাই এ লেখাটি পড়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তবেই স্বপ্নের জগতে পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে!

মন ভালো করার টোটকা

আমরা সবাই কিন্তু শারীরিক ভাবে সুস্থ্য হলেও মানসিকভাবে কমবেশী অসুস্থ!

শুনে হয়তো আমাকেই পাগল ভাবছো অনেকে, সবাই কী করে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়? কিন্তু, কথাটার সত্যতা আছে। এই যে আমাদের নতুন প্রজন্ম ভুগছে 'ভাল্লাগে না' রোগে, এটি কি অসুস্থতা নয়? কাজ করতে ভাল্লাগে না, ঘুমাতে ভাল্লাগে না, খেতে ভাল্লাগে না, পড়তে ভাল্লাগে না- ভালো না লাগার পাল্লাই ভারি তাদের জীবনে। আবার অনেকেই আছে ডিপ্রেশন জোনে। আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, আমার জীবন রেখে কী লাভ, সমাজের কাছে বোঝা আমি। এমন সব চিন্তায় প্রতিনিয়ত ডিপ্রেসড হচ্ছে অনেকেই।

ডিপ্রেশন এমন একটি ব্যাধি, যা আক্রমণ করে সবাইকে। আমার নিজেরও ডিপ্রেশন আসে, আমিও বেশ হতাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু তখনই মনে হয় ডিপ্রেশন আমাকে পেয়ে বসার আগে আমি ডিপ্রেশনকে হারিয়ে দেবো! এই চিন্তাটা থাকার কারণে ডিপ্রেশন জিনিসটা আর জেঁকে বসতে পারে না। ডিপ্রেসড হয়ে বসলে আমি বেশকিছু কাজ করতে থাকি, যতক্ষণ না এই ডিপ্রেশন ব্যাটা হার না মানে! আজ তোমাদের এই কাজগুলো নিয়েই বলি–

১. কাউকে খুশি করার চেষ্টা কর:

খেয়াল করে দেখবে, তুমি ডিপ্রেসড থাকলে তোমার মধ্যে একটা ধারণা চলে আসে, তুমি কোন কাজের না, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। এই সময়টায় যদি তুমি চেষ্টা কর অন্য কারো মুখে হাসি ফোটানোর, তাহলে দেখবে অন্যরকম একটা তৃপ্তি আসবে তোমার মনে। এর কারণ দুটো। একটা হলো, তোমার কারণে কেউ আনন্দ পেল, এতে তোমার ডিপ্রেশনটা ধারে কাছে আসতে পারলো না। আরেকটা হলো, 'তুমি কোনো কাজের না' এই ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হলো তোমার নিজের কাছেই!

২. নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করা বন্ধ কর:

ডিপ্রেশনে পড়লে আরেকটা খুব কমন ব্যাপার ঘটে, অন্যান্য সুখী মানুষগুলোর সাথে আমরা নিজেদের তুলনা করা শুরু করি। তাতে আরো বেশি ডিপ্রেসড হয়ে পড়ি সবাই। তাই এমন ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পেতে চাইলে সবার আগে অন্যদের সাথে তুলনা বন্ধ করে নিজেকে নিয়ে ভাবা শুরু করতে হবে।

৩. উদার মানসিকতা বজায় রাখো:

ডিপ্রেশন থেকে মুক্তির আরেকটি অস্ত্র হলো উদার মানসিকতার প্রকাশ। ভেবে দেখ তো, যদি তোমার রাগ দুঃখ সব একাকার হয়ে যায় তাহলে ডিপ্রেশন কি আরো বেশি বাড়বে না? তাই সুন্দর ও উদার মানসিকতা দেখাতে পারলে ডিপ্রেশন ধারে কাছে ভিড়তে সাহস পাবে না!

৪. নিজেকে নিয়ে আশাবাদি থাকো:

নিজেকে নিয়ে আশাবাদি থাকাটা হতাশা থেকে দূরে থাকার একটি দরকারী কৌশল। ডিপ্রেশন সবার আগে আঘাত করে আত্মবিশ্বাসে, আশাবাদ কমিয়ে দেয় গোড়া থেকেই। তাই মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে যদি তুমি একবার প্রতিজ্ঞা করে উঠতে পার– "আমার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।" তাহলেই কেল্লাফতে! ডিপ্রেশন আর তোমাকে ছুঁতেও পারবে না।

৫. মন থেকে ঈর্ষা দূর করে ফেলো :

আমরা নিজেদের যতই উদারমনা মনে করি না কেন, অপরের সাফল্য মেনে নিতে সবারই কষ্ট হয়। ডিপ্রেশনে থাকার সময় সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এই ঈর্ষা দূর করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার। শুধুমাত্র তখনই ডিপ্রেশনের ভয়কে জয় করা যাবে, অন্যের সাফল্য যখন তোমার মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াবে না।

৬. নেতিবাচক মানুষদের এড়িয়ে চলো :

ডিপ্রেশনের সময়গুলোতে কেন যেন নেতিবাচক মনের মানুষগুলোর সাথেই বেশি দেখা হয়ে যায়। এই নেতিবাচক মানুষগুলোর কথায় আশার আলো

পাওয়া তো যায়ই না, বরং তাদের সমালোচনার চোটে হতাশা কাটিয়ে ওঠার আশাগুলো হারিয়ে যেতে থাকে। এরকম হতাশা উদ্রেগকারী মানুষদের যথা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে যেতে হবে।

এ কাজগুলো শুধুমাত্র ডিপ্রেশনের সময়গুলোতেই নয় অন্যান্য সময়েও করতে থাকলে দেখবে আর কখনো ডিপ্রেশন তোমার ধারেকাছেও আসতে পারবে না! তাই এগুলোকে অভ্যাসে পরিণত কর, সুখী সুন্দর জীবন তোমার নিশ্চিত হবেই!

একজন বৃক্ষমানবের গল্প

ফরিদপুরের ছোট্ট একটা গ্রাম। ভগণডাঙ্গা নাম। কাকডাকা ভোর। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা রিকশা এগিয়ে আসছে। রিকশার চালকের বয়স হয়েছে। রিকশা চালাতে কষ্ট হচ্ছে। বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখাও দেখা যাচ্ছে। রিকশায় কিন্তু মানুষ নেই। একটা গাছের চারা। মানুষটা পরিশ্রম করে একটা গাছের চারা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? একটু পরেই মিলল সে প্রশ্নের উত্তর। রাস্তার এক পাশে অদ্ভুত মায়ার সাথে পুঁতে দিলেন তিনি গাছের চারাটা। কিন্তু কে এই শ্মশ্রুমন্ডিত মানুষটি? কেনই বা এমন কাজ করছেন?

কাছে গিয়ে দেখা গেল, ইনি তো ফরিদপুরের বিখ্যাত সামাদ চাচা! ষাটোর্ধ্ব মানুষটি পরিশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তার চোখেমুখে খুশির আভাস দেখা যাচ্ছে। আরো একটি দিন তো তিনি গাছ লাগাতে পেরেছেন! প্রশ্ন আসে, কে এই সামাদ চাচা! কেন একজন সাধারণ রিকশাচালককে একটা জেলার সবাই চেনে? উত্তর সেই গাছেই।

একজন বৃক্ষমানবঃ

ফরিদপুরের এই পৌঢ় মানুষটি গত আটচল্লিশ বছর ধরে প্রতিদিন অন্তত একটি হলেও গাছ লাগিয়েছেন। সেই ছোটবেলা থেকে শুরু , এখনো বিপুল উদ্যমে তিনি বৃক্ষরোপণ করেই চলেছেন! এখন পর্যন্ত এই মানুষটি সতেরো হাজারেরও বেশি গাছ লাগিয়েছেন!

সামাদ চাচার এই দারুণ কাজ চোখ এড়ায়নি এলাকাবাসীর। সেই থেকেই প্রবীণ এই রিকশাচালককে সবাই চেনে বৃক্ষ সামাদ হিসেবেই। তার ভাষ্যমতে, গাছ না লাগালে নাকি তার ঘুম হয় না! একবার ভাবো তো, একজন মানুষ, যার দৈনিক আয় একশ টাকাও হয় না অনেক সময়, তিনি প্রতিদিন একটি করে গাছ লাগিয়ে পরিবেশ উন্নত করছেন । আর আমরা কী করছি?

সত্যিকারের সুপারহিরোঃ

ছোটবেলায় আমার শখ ছিল, যখন যেই ট্রেন্ড চলে, তার সাথে তাল মিলিয়ে চলা। তাতে নিজেকে অনেক 'কুল' ভাবা যেত! একদম ছোটবেলায়

দেখতাম সবাই ব্যাগি প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতো, আব্বুর সাথে বাজারে গেলে তাই প্রতিনিয়ত ব্যাগি প্যান্টের খোঁজে অস্থির হয়ে যেতাম! আর খেলতাম পোকেমন কার্ড, সবাই যাতে বলে– "আরে! আয়মান ছেলেটার তো অনেক ভাব!"

একটু বড় হয়ে দেখলাম যে এসব আর কুল নয়, কুল হলো স্পাইক করা চুল নিয়ে ঘোরা। যেই ভাবা সেই কাজ, লেগে পড়লাম চুল স্পাইক করার মিশনে। এখনো মনে আছে, গোসল করে মাথায় টুপি পরে ঘুরতাম যাতে চুলগুলো স্পাইক করা থাকে! বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে দেখি আরেক কাহিনি। এখন ইংরেজিতে কথা বলা, ইংরেজি মুভি দেখে সেই নিয়ে বকবক করাটা অনেক কুল, তাই সেটা শুরু করলাম।

পড়ালেখা শেষ করে এখন বুঝতে পারছি, সত্যিকারের কুল আসলে কী। না, এতে কোনো ভাব নেই। বলছি সামাদ চাচার কথা। এই মানুষটি সত্যিকারের কুল, তিনিই আসল সুপারহিরো। বাস্তবের সুপারহিরোরা আলখেল্লা পরে পৃথিবী বাঁচায় না, একজন রিকশাচালকও তার সামর্থের সবটুকু দিয়ে গাছ লাগিয়ে পৃথিবী বাঁচাতে পারেন।

ডেইলি স্টার ও সামাদ চাচা:

সামাদ চাচার খবর এখন আর পৃথিবীর অজানা নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে অনেকেই এখন তাকে চেনেন। বাংলাদেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোর একটি, The Daily Star এর ২৬ বছর পূর্তিতে সামাদ চাচাকে ঢাকায় এনে সংবর্ধনা দেয়া হলো। ভাগ্যক্রমে আমিও সেখানে ছিলাম, তাই এমন একজন মাটির মানুষের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

দেখলাম, সামাদ চাচার মুখ ভার। তার মুখে হাসি নেই। সবাই জিজ্ঞেস করছে তাকে, কিছু লাগবে কি না, তিনি কিছু খাবেন কি না। তবুও তাকে চিন্তাগ্রস্ত লাগে। অবশেষে একসময় সত্য জানা যায়। উনি ঢাকায় এসে আজ একটা গাছও লাগাতে পারেননি, তাই তার মন খারাপ।

তৎক্ষণাৎ একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সামাদ চাচাকে গাছের চারা এনে দেয়া হলো, তিনি মহাব্যস্ত হয়ে গাছ লাগালেন। তার মুখে হাসি ফিরে এলো। তিনি স্বস্তি পেলেন, একদিনের জন্যেও গাছ লাগানো মিস হলো না! আর আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবলাম, এ কেমন মহামানুষ?

সামাদ চাচার মতো চার যুগ ধরে গাছ লাগানোর মত প্রায় অসম্ভব কাজ আমরা হয়তো কেউই পারব না। কিন্তু আমরাও কিন্তু চাইলেই প্রতিদিন একটা করে ভালো কাজ করতে পারি। সেটা হতে পারে এলাকার বৃদ্ধ এবং দরিদ্র কোনো মানুষকে একবেলা ভরপেট খাওয়ানো, কিংবা পথশিশুদের জামাকাপড় কিনে দেয়া ইত্যাদি অনেক কিছু! সবকিছুই করা সম্ভব, যদি তোমার সেই সদিচ্ছাটুকু থাকে।

সময় বাঁচানোর শতভাগ কার্যকর কৌশল!

বর্তমান প্রজন্মের বড় একটা সমস্যা হলো যে তারা এত বেশি আর ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে যে, প্রায়ই দেখা যায় কোনো না কোনো কাজ করার জন্যে সময় জোগাড় করাই যায় না। শুধু সেটাই না, এই কাজগুলো আর পরে করার সময় পাওয়া যায় না। ডেডলাইন মিস হয়, জমা হয় আক্ষেপ। পরমুহূর্তেই আবার নতুন নতুন ডেডলাইন আসে, নতুন কাজের নিচে চাপা পড়ে যায় না করা কাজগুলো। এভাবে একবার না করা কাজগুলো আর কোনোদিনই করা হয়ে ওঠে না। ব্যস্ততা সেগুলোয় আর হাত দিতে দেয় না, একসময় ফুরিয়ে যায় তার প্রয়োজনীয়তা।

আমারও ঠিক এরকমই হতো কাজ করার সময়। একগাদা কাজের ভিড়ে পুরনো কাজ খুঁজে পেতাম না, সেগুলো আসলেই আর করা হতো না কোনোদিনই। এরকম সময়ে সন্ধান পেলাম দারুণ একটা ট্রিকের। এটাকে বলা হয় Time hack! খুব বেশি সাধারণ এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করার পর থেকে সময়ের কাজ সময়ে করে ডেডলাইন পার করতে আর কোনো অসুবিধা হয়নি আমার। ভালোভাবেই করে ফেলেছি সব কাজ!

এই পদ্ধতিটা কয়েক ধাপে করে এগোতে হয়। সবগুলো ধাপ শেষ করার পর দেখবে যেকোনো ডেডলাইনের আগেই তোমার কাজ প্রস্তুত! দেখে নাও সে ধাপগুলো :

ধাপ-১:
প্রথমেই তোমাকে কাগজে একটা লিস্ট করতে হবে। লিস্টে থাকবে পরের দিন যে কাজগুলো করবে, সেগুলোর নাম আর বিবরণ। এ কাজটা করতে হবে ঘুমাতে যাবার ঠিক আগে, কারণ তাতে নতুন কোনো কাজ যোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

তোমার হয়তো মনে হবে, কাজ লিস্টে লিখে কী লাভ, এমনিতেই তো মনে থাকে! সত্যিটা হলো, এগুলো আসলে মনে থাকে না। ঠিক যেমন ক্লাসের

পড়ার নোট না নিলে দুই দিন পর ক্লাসে কী হয়েছে সেটা আর মনে থাকে না, কাজের ক্ষেত্রেও তাই। এজন্যেই লিস্টে সুনির্দিষ্ট করে সবগুলো কাজের নাম লিখতে হবে।

ধাপ-২:

দিনের শুরু থেকেই লিস্টের কাজ একে একে শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, দিনের শুরু হলেই আমাদের নিজের কাজ বাদে অন্য কিছু করতে ইচ্ছা করে, কারো হয়তো ইউটিউবে গান শুনতে ইচ্ছা করে, কারো একটু ফেসবুকিং করতে। কিন্তু এগুলো করার আগে লিস্টের কাজ শেষ করার দিকে মন দিতে হবে। লিস্টের কাজ শেষ হয়ে গেল কোনো সমস্যাই নেই, কিন্তু শেষ করার আগে অপ্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ না করাই ভালো।

ধাপ-৩:

এক একটা কাজ শেষ করবে, এবং তারপর সেগুলো এক এক করে কেটে দিবে। হ্যাঁ, তোমার মনে হতে পারে কাজ শেষ হলে সেটা তো মনেই থাকবে, কাটার কি দরকার। কিন্তু এই যে একটা কাজ শেষ করে কেটে দিলে যে একরকম বিজয়ের আনন্দ মেলে, এটা আর কোথাও পাবে না তুমি। তাই কাজ শেষ করা মাত্র সবগুলো কেটে দেবে।

ধাপ-৪:

সবগুলো কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে প্রতিদিন। হ্যাঁ, তোমার হয়তো অনেক ব্যস্ততা থাকতে পারে, অন্য কিছুতে তুমি ব্যস্ত থাকতেই পার, কিন্তু লিস্টের কাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই চেষ্টা করবে দিনের কাজ সব দিনেই শেষ করে ফেলতে।

ধাপ-৫:

এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে তুমি প্রতিদিন লিস্টের সব কাজ শেষ করতে পারবে না। বিভিন্ন বিচিত্র কারণে তুমি দেখা গেল আটকে গেলে, লিস্টের কাজ শেষ হলো না। তাহলে উপায়?

উপায় অতি সহজ। যেদিন লিস্টের কাজ শেষ হবে না কিন্তু দিন ফুরিয়ে যাবে, তুমি সেদিন বাদ পড়া কাজগুলোকে পরের দিনের

লিস্টের লিখে ফেলবে! তাহলেই বাদ গেলেও বন্ধ হবে না কাজ, পরের দিন করা হবে সেই কাজটি!

ধাপ-৬:

সারাদিন কী কী করলে তার একটা লিস্ট করে ফেলতে পার। এতে একটা উপকার হবে; লিস্টের কাজগুলো সব করা হয়েছে কিনা, সেটা চেক করে নিতে পারবে এর মাধ্যমে। বলা যায় না, অসাবধানে কোনো কাজ না করা হয়ে থাবলে এই লিস্টে সেটা ধরা পড়বেই!

ধাপ-৭:

মানুষের ব্যস্ততা সবসময় একরকম থাকে না। জীবনে এমনও সময় আসতে পারে, যখন কাজের চাপ এত বেশি বড় হয় যে লিস্ট করেও কুলিয়ে ওঠা যায় না। এরকম সময়ে লিস্ট বাড়িয়ে ফেলতে হয়। বিশাল বড় একটা লিস্ট, সেখানে সব কাজ থাকবে। তাহলেই যত বেশি কাজই হোক না কেন, সামলে নেয়া সম্ভব হবে।

সময়কে হার মানানো খুব বেশি সহজ কাজ নয়। কিন্তু নিয়মিত একটা সময় ধরে কাজ করলে যেকোনো কাজ শেষ করাটা আর কোনো সমস্যাই নয়।

ফেসবুক সদ্ব্যবহারের ৩ টি কার্যকরী আইডিয়া

২০১৬ বছরটা আমার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর ছিল। অনেক কিছু শিখেছি, জেনেছি, স্বপ্ন দেখার সাহস পেয়েছি। আর পেয়েছি ফেসবুককে কাজে লাগানোর দারুণ তিনটা আইডিয়া। ফেসবুককে শুধুই একটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে না দেখে, এটাকে ব্যবহার করে ঘটিয়ে দেয়া যায় অসাধারণ কিছু পরিবর্তন!

আইডিয়া ১: Bio তে রক্তের গ্রুফ লেখা

Bio তে নিজের রক্তের গ্রুপ রক্ত সংগ্রহ হোক আরো সহজ! এই আইডিয়াটা বস্নাড গ্রুপ নিয়ে। আমাদের আশপাশে এমন অনেক সংস্থা আছে যারা এই রক্ত সংগ্রহের জন্যে, মুমূর্ষু রোগীদের একটুখানি বাঁচার সুযোগ করে দেবার জন্যে দিন রাত খেটে চলেছে। এমনই একটা সংস্থার একজন আমাকে একটা আইডিয়া দেয়। খুব সহজ কিন্তু দারুণ কার্যকরী একটা আইডিয়া।

আমাদের সবারই কিন্তু একটা সোশ্যাল আইডি কার্ড আছে। তার নাম সোশ্যাল মিডিয়া, যাকে ফেসবুক বললে ভুল হবে না। এই ফেসবুকে প্রোফাইল অংশটায় ছোট্ট একটা Bio অংশ আছে। সেখানে আমরা নিজের পরিচয় দেয়ার পাশাপাশি যদি নিজের বস্নাড গ্রুপটাও দিয়ে দেই, তাহলে এই রক্ত সন্ধানীদের জন্যে অনেক সুবিধা হয়ে যায়, তাই না? এতে আরো দ্রুত রক্ত সংগ্রহ করা যাবে, হয়তো বাঁচানো সম্ভব হবে আরো কিছু প্রাণ!

আইডিয়া ২: ফেসবুকেই হোক গ্রুপ স্টাডি

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় সব ব্যাচেরই নিজেদের জন্যে একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে। সেখানে তারা ডিপার্টমেন্টের নানা খবর, নোটিশ নিয়ে পোস্ট করে। আমার ছোটভাইকে সেদিন দেখলাম এরকম গ্রুপ আর ফেসবুক লাইভকে ব্যবহার করে চমৎকার একটা কাজ করছে। পরীক্ষার আগের রাতে সে তাদের ফেসবুক গ্রুপে লাইভে গিয়েছে, এবং সেখানে সে

পরীক্ষা নিয়ে তার বন্ধুদের করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে! পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছে, কোন্ চ্যাপ্টারের কোথায় কী পড়তে হবে সব বলে দিচ্ছে সে। আমার নিজের ফার্স্ট ইয়ারের কথা মনে হয়। আমরা তখন পরীক্ষার আগে আগে যে বন্ধুটা সবচেয়ে ভালো পড়া পারে, তাকে ঘিরে বসে পড়া বুঝে নিতাম। এই সমস্যার কি সুন্দর ডিজিটাল সলিউশান হয়ে গেল এভাবে! তোমাদের মধ্যে যে ভালো পড়া পারো, সেটা যে বিষয়েই হোক, তা নিয়ে যদি তোমরা এভাবে তোমাদের গ্রুপে লাইভে যাও, কি দারুণ হবে না ব্যাপারটা? এতে যে বন্ধুটা পড়াশোনায় দুর্বল তার যেমন উপকার হবে, তেমনি ভালো ছাত্রদেরও ঝালাই করে নেয়া হবে তাদের পড়াগুলো!

আইডিয়া ৩: একটি শেয়ারেই হবে স্বপ্নপূরণ

এই আইডিয়া আমি পাই একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে। আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ, আরিফ আর হোসাইনের একটা স্ট্যাটাস থেকে!

একটা স্কুল বানানো হচ্ছিল। কিন্তু অর্থের অভাবে কাজটা আর এগোচ্ছিল না। আরিফ ভাইয়া একটা স্ট্যাটাস দিলেন। খুব সহজ কাজ। স্কুলটার জন্যে সবাইকে বললেন একটা করে শেয়ার কিনতে। ৩০০ টাকার একটা শেয়ার। কিছুদিনের মধ্যেই প্রচুর মানুষ এই শেয়ার কিনে জোগাড় করে ফেললেন স্কুলের টাকাটা! একবার ভাবুন তো? আপনার শেয়ারের কারণে কত শিশুর মুখে হাসি ফুটছে? মনটাই ভালো হয়ে যায় না ভাবলে? এইভাবে একটা শেয়ার কেনার ভালো কাজের মাধ্যমে বিশাল একটা ভালো কাজের অংশ হয়ে গেলেন আপনিও! আর ফেসবুককে কাজে লাগিয়ে এখানেও ঘটে গেল ছোটখাটো একটা বিপ্লব।

আবার ফেসবুকে অনেকেই অনেক কিছু নিয়ে পোস্ট করে, সেগুলোর কোনো কোনোটা এতই অজনপ্রিয় হয় যে পোস্টদাতার ফেসবুক জীবন বিষিয়ে ওঠে! এই ব্যাপারটার একটা সমাধান আছে। মনে করুন, আপনি একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে। এখন চৌরাস্তার মাঝে কিন্তু আপনি কাউকে গালিগালাজ করতে পারেন না, নিজের ব্যক্তিগত তথ্য বলে বেড়াতে পারেন না। কারণ সেখানে পরিচিত অপরিচিত অনেকেই আপনাকে দেখছে! ফেসবুক অনেকটা এই চৌরাস্তার মতোই। তাই এরপর থেকে যখন ফেসবুকে কোনোকিছু নিয়ে পোস্ট করবেন বা লাইভে যাবেন, একটা

ব্যাপার মাথায় রাখবেন যে, চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কি এই কথাগুলো বলতে পারতেন আপনি? যদি পারেন, তাহলে করে ফেলুন পোস্ট। না পারলে দয়া করে করবেন না, কারণ সেটিই হতে পারে আপনার ফেসবুক একাউন্টের মৃত্যুর কারণ!

২০১৮—নতুন এই বছরটি হোক আপনার পরিবর্তনের বছর। ফেসবুক ব্যবহার করুন সঠিক নিয়মে, এটাকে কাজে লাগিয়ে শুরু করুন দারুন কিছুর! স্বপ্ন দেখতে শিখুন, স্বপ্ন দেখলে সাফল্য আসবেই!

ছাত্রজীবনে অর্থ উপার্জনের ১০টি উপায়

ছাত্রজীবনটা শুধু নাক মুখ গুঁজে পড়ালেখা করে কাটিয়ে দেবার জন্য নয়। পড়ালেখার পাশাপাশি অন্যান্য অর্থ উপার্জরের কার্যক্রমে অংশ নিলে একদিকে যেমন নতুন কিছু করার জন্য তোমার কাছে অর্থের শক্তি থাকবে তেমনি অন্যদিকে বৃদ্ধিপাবে আত্মবিশ্বাস, প্রকাশ ক্ষমতা, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠালাভের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন থেকেই অর্থ উপার্জনের কথা ভাবতাম, কারণ এতে ছাত্রজীবনেই স্বনির্ভরশীল হবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। আজ তাই ছাত্রজীবনে অর্থ উপার্জন করার দারুণ ১০টি টিপস বলবো, যেগুলোর যেকোনো একটি অনুসরণ করলেও এই উপার্জনের ব্যাপারটা অনেক বেশি সহজে হয়ে যাবে।

১. খুঁজে নাও টিউশনি:

আমি আমার লাইফের প্রথম টাকা উপার্জন শুরু করি টিউশনি করে। আমার এখনো মনে আছে, তিন হাজার টাকার একটি টিউশনি পেয়েছিলাম ৪র্থ শ্রেণীর এক ছাত্রকে পড়িয়ে। যেখান থেকে শুরু করি ব্যাচ পড়ানো এবং এভাবে তা আরো বাড়তে থাকে! আজ তোমরা যে ১০ মিনিট স্কুল দেখছো, তার প্রাথমিক খরচগুলো কিন্তু আমার টিউশনির টাকা থেকেই দেয়া হয়েছিল! তাই আজ থেকেই টিউশনি শুরু করে দিতে পারো!
প্রশ্ন আসবে "কিন্তু আমি যে টিউশনি পাই না? আমার কী হবে?" এক্ষেত্রে আমার প্রথম টিউশনির গল্প বলি। আমরা চার বন্ধু মিলে একটা লিফলেট বানিয়েছিলাম, 'পড়াতে চাই' লিখে। সেগুলো আমাদের এলাকার দেয়ালগুলোয় সেঁটে দিয়েছিলাম সবাই মিলে। শুনতে অবাক লাগবে, কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা সবাই নিজ নিজ টিউশনি পেয়ে গিয়েছিলাম! তুমিও একই কাজ করতে পার, সাফল্য আসবেই!

২. ডিজাইনিং এর দক্ষতা কাজে লাগাও:

এটা আমার অনেক পছন্দের একটি কাজ। আমি আমার ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষ থেকেই ডিজাইনের কাজ শুরু করেছিলাম। কিছুদিন পর খেয়াল

করে দেখি প্রচুর ডিজাইনিং এর কাজা পাওয়া যাচ্ছে। এখন তো একজন ভালো ডিজাইনারের ডিমান্ড আরো বেশি! তাই তুমি যদি ভালো ডিজাইনিং করতে পার তবে বসে কেন? আজ থেকেই তুমি উপার্জন শুরু করে দিতে পার, শুধু নিজের সাম্যর্থের পরিচয় দেবার অপেক্ষা!

৩. এডিটিং স্কিলের সঠিক ব্যবহার কর:

"ভিডিও এডিটিং" এর ধারণাটি খুব বেশি পুরনো না হলেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্কিল। তোমরা যারা টেন মিনিট স্কুলের ভিডিওগুলো দেখ তারা খেয়াল করবে, প্রতিটি ভিডিও এডিট করা। এই এডিটিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বর্তমান যুগে সবাই উন্নতমানের ভিডিও চায় কিন্তু ভালো ভিডিও এডিটর পায় না। তাই তোমরা যারা ভালো এডিটিং পার তোমাদের সামনে সুবর্ণ সুযোগ অর্থোপার্জনের!

৪. লেখার হাত ঝলাই করে নাও:

লিখতে আমরা সবাই পারি। কিন্তু ক'জনই বা পারি তার লেখাটা খবরের কাগজে ছাপাতে? তোমার লেখার হাত যদি ভালো হয় তাহলে তোমার সামনে সুবর্ণ সুযোগ! বাংলা কিংবা ইংলিশ যে ভাষাই হোক, চলবে। প্রচুর বস্নগিং সাইট আছে, নিউজ পেপার, অনলাইন নিউজ পোর্টাল আছে যে সব জায়গায় প্রচুর রাইটারের প্রয়োজন এমন কি ১০ মিনিট স্কুলেও। তাই যারা লেখালেখিতে ভালো, এই গুণটি কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনের পন্থা খুঁজে নিতে পারো!

৫. ঘরে বসেই ফ্রিল্যান্সিং:

বর্তমান প্রজন্মের কাছে সবচাইতে আলোচিত একটি শব্দ ফ্রিল্যান্সিং। ফ্রিল্যান্সিং এর অর্থ হলো স্বাধীন বা মুক্তপেশা। অন্যভাবে বলা যায় নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করা কে ফ্রিল্যান্সিং বলে। আমার মনে হয় এ কাজটির মানে তোমরা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছ।

কোনো একটা বাইরের কাজ তুমি ফ্রিল্যান্সার হয়েই করে দিচ্ছো। ধরো তুমি ডিজাইনিং এ পারদর্শী, কেউ বা আবার ওয়েব ডেভেলপমেন্টে! এমন আরো অনেক কাজ করে দিতে পারছো ফ্রিল্যান্সার হয়েই। তুমি বাংলাদেশে

বসে আমেরিকার যে কারো কাজ করে দিতে পারবে। এমন হাজার হাজার কাজ আছে "আপওয়ার্কে" গেলেই তুমি সে সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে!

৬. কাজ কর এজেন্সির হয়েঃ

এটি এক ধরনের কোম্পানি যে কোম্পানিগুলো বড় বড় কোম্পানির জন্য ভিডিও এডিটিং করে দেয় ডিজাইনিং করে দেয় প্রেজেন্টেশন তৈরি করে দেয়, কর্পোরেট ইভেন্ট নামিয়ে দেয়। তুমি যদি এরকম কোনো কাজে পটু হয়ে থাকো তাহলে অনেক কোম্পানি তোমাকে খুঁজে নিবে তাদের কাজের জন্যে। এমন কী চাইলে তুমিও যোগ দিয়ে ফেলতে পার যেকোন এজেন্সিতে!

৭. শখ যখন অর্থ উপার্জনের সহায়ক (ফটোগ্রাফি):

এটি বিশাল এক সুযোগের হাতছানি শিক্ষার্থীদের জন্য। যারা ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি পারো তাদের হয়তো বিস্তারিত বলার দরকার নেই যে কত ধরনের সুযোগের হাতছানি তাদের সামনে!

"Wedding Photography, Corporate Photography, Event Photography" ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ তাদের জন্যে খোলা রয়েছে। তোমরা যারা ১০ মিনিট স্কুলের ভিডিওগুলো দেখ সেগুলোর পেছনের কলাকুশলীরাও কিন্তু ফটোগ্রাফাররাই! তাই যারা এসবে অনেক পারদর্শী তাদের জন্য বেশ ভালো একটা উপার্জনের মাধ্যম হতে পারে ফটোগ্রাফি।

৮. ছোটখাট ব্যবসা শুরুর জন্যে ছাত্রজীবন দারুণ সময়ঃ

আমাদের নতুন যে টি শার্টগুলো দেখছ তার ডিজাইনটি আমাদের হলেও আমাদের এক ছেলে তার নতুন করা কোম্পানি থেকে আমাদের এই টি-শার্টগুলো বানিয়ে দিয়েছে। এমন আরো অনেক ছোট ছোট আইডিয়ার মাধ্যমে শুরু হতে পারে তোমাদের ছোট ব্যবসার পথচলা যা কিনা হয়ে উঠতে পারে তোমার স্বপ্নের চেয়েও বড়।

৯. ডিজিটাল যুগে কোডারের জুড়ি নেইঃ

আইসিটির জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে পুরো পৃথিবী। তুমি যদি কোডিংয়ে ভালো হও তাহলে তুমি এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট করতে পার, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট

করতে পার, এমন কি হতে পারে তুমি কোনো একটা বড় কোম্পানির জন্য সফটওয়্যার তৈরি করে ফেলেছো! ১০ মিনিট স্কুলে আমরা ডিজাইনার খুঁজি, এনিমেটর খুঁজি এবং অনেক কোডার ও খুঁজছি যারা কিনা আমাদের জন্যে নতুন নতুন ফিচার তৈরি করতে পারবে। তাহলে আর দেরি কেন? কোডার হয়ে থাকলে কাজে লাগাও তোমার দক্ষতাকে!

১০. ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে অভিজ্ঞ হও:

আমরা অনেকেই অনেক ধরনের ইভেন্টে যাই। আমার অনেক বন্ধুই এই ধরনের ইভেন্টে কাজ করছে। হতে পারে ফুড ফেস্টিভাল, কর্পোরেট ইভেন্ট, পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এমন আরো অনেক কিছু যা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করে পরিচালনা করাই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মগুলোর কাজ। তোমার যদি এই ব্যাপারে দক্ষতা থাকে তাহলে এমন অনেক ম্যানেজমেন্ট ফার্ম আছে যেখানে তুমি তাদের সাথে কাজ করতে পারো, কিংবা বন্ধুদের নিয়ে নিজেই একটা ফার্ম খুলে ফেলতে পারো!

তাহলে আর দেরি কেন? দ্রুত কাজে লাগাও এই টিপসগুলোকে, খুঁজে নাও তোমার পছন্দের কাজ, আর ছাত্রজীবনেই শুরু কর অর্থ উপার্জন!

ডিজিটাল ওরিয়েন্টেশন ও একটি স্বপ্নের কথকতা

আমার এক বন্ধু সেদিন আমাকে বলল, "জানিস আয়মান? আমরা না, শিক্ষিত হবার আগেই ডিজিটাল হয়ে গিয়েছি।" শুনে অবাকই হলাম। প্রশ্ন করলাম, এর মানে কী? উত্তরে সে যা বলল, সেটা অনেকদিন আমার মাথায় থাকবে। বন্ধুটি বলেছিল, "আমরা সবাই কিন্তু স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু তে ওরিয়েন্টেশন বা পরিচিতি পেয়েছি। কী করতে হবে, কী করতে হবে না, এসব জ্ঞানও বলতে গেলে সেখান থেকেই জেনেছি আমরা। কিন্তু এই যে ডিজিটাল লাইফে চলে এলাম সবাই, যেমন ফেসবুকের জগতে প্রবেশ করার সময় কোনো ওরিয়েন্টেশন কি পেয়েছি আমরা?"

একটু থেকে লম্বা একটা দম নিয়ে আবার বলা শুরু করল বন্ধুটি। আমি ততক্ষণে আশ্চর্য হয়ে ভাবছি আরে আসলেই তো! বন্ধু বলে উঠল, "ফেসবুক একটা ভার্চুয়াল জগৎ, তাই বলে যা খুশি তা কিন্তু করা উচিত না এখানে। কিন্তু আমরা কী করি? মার্ক জাকারবার্গের লাইভ ভিডিওতে গিয়ে সুন্দরমত কমেন্ট করে আসি, ভাই চিকন পিনের চার্জার হবে? ব্যাপারটা কিন্তু নেহাতই রসিকতার পর্যায়ে থাকে না আসলে। কারণটা জানিস?"

আমি তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর কথা শুনছি। কোনোমতে বললাম, "নাহ! শুনি কী কারণ!" বন্ধুর উত্তর, "এই যে বাঙ্গালিদের এরকম কমেন্ট, এগুলো কিন্তু শুধু একজন মানুষকে রিপ্রেজেন্ট করে না। এগুলো একটা দেশকেও রিপ্রেজেন্ট করে। এসব দেখে বিদেশের মানুষেরা মনে করতেই পারে, বাঙ্গালিরা হচ্ছে বোকা, তারা জানেও না কোথায় কী কমেন্ট করতে হয়। একবার ভেবে দেখেছিস ব্যাপারটা আমাদের দেশের জন্য কী সাংঘাতিক অপমানজনক?"

ওর কথা শুনে চিন্তা করে দেখলাম একশো ভাগ সত্যি কথা বলেছে বন্ধুটি। একেবারে মানসম্মানের ব্যাপার দেখছি! ভাবলাম কী করা যায় এটা নিয়ে। তখনই মাথায় আসল, আমি নিজেই একটা ডিজিটাল ওরিয়েন্টেশন নিয়ে ফেলি না কেন! যেই ভাবা সেই কাজ, শুরু করে দিলাম এই নিয়ে একটা ভিডিও বানানো!

ফেসবুককে কিন্তু আমাদের ডিজিটাল প্রোফাইল বলা যেতে পারে। তোমার বাস্তব জীবনের চেনা মানুষগুলো থেকে এই ভার্চুয়াল জগতের চেনা মানুষের সংখ্যা কিন্তু বেশি। তাই তোমার ডিজিটাল ওরিয়েন্টেশন হবে ফেসবুক প্রোফাইল আর তার ব্যবহারগুলো নিয়েই। ফেসবুককে সঠিকভাবে ব্যবহার করার সবচেয়ে দরকারি ব্যাপারগুলো নিয়ে বলা যাক তাহলে :

১. ফেসবুক আইডি:

আমরা আমাদের পরীক্ষার সার্টিফিকেটে আমাদের পুরো নামটাই দেই, তাই না? ফেসবুককে যেহেতু আমাদের ভার্চুয়াল প্রোফাইল বলা হচ্ছে তাই ফেসবুকেও তোমার পুরো নামটা দেয়া উচিত। তোমার নাম সত্যিই যদি অদ্ভুত বালক, এঞ্জেল কণ্যা বা ড্রিম বয় রিফাত না হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো বাদ দিয়ে তোমার ফেসবুক আইডির নাম দিতে হবে আসল নাম দিয়ে। নইলে কোনো একদিন ফেসবুক সিদ্ধান্ত নেবে, এমন মিথ্যা নামের কারো থাকার সম্ভাবনা নেই, তাই গায়েব হয়ে যাবে তোমার ফেসবুক প্রোফাইল।

২. প্রোফাইল পিকচার:

তুমি যদি তোমার প্রোফাইল পিকচারে সালমান খান বা একটা গোলাপ ফুলের ছবি দাও, তখন মানুষ স্বভাবতই মনে করবে যে তুমি তো সালমান খান নও, আর গোলাপ ফুল তো আর ফেসবুক আইডি খুলতে পারে না, তাই তোমার নিশ্চয়ই কোনো কু-মতলব আছে! এরকম অহেতুক সন্দেহ থেকে বাঁচতে নিজের প্রোফাইল পিকচারে নিজেরই একটা ছবি দিয়ে ফেলো, যদি না অন্য কোনো সমস্যা না থেকে থাকে।

৩. ফেসবুক পোস্ট:

ফেসবুকের নিউজ ফিডকে বলা যায় ভার্চুয়াল জগতের চৌরাস্তা। তুমি কি চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ইচ্ছেমতো যা মন চায় উল্টোপাল্টা সব বলতে পারবে? পারবে না। সেজন্যে ফেসবুকে কোনো পোস্ট করার আগে একটু ভেবে নেবে, চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে কি এরকম কোনো কাজ করতে পারতে তুমি? না পারলে দয়া করে এমন কোনো পোস্ট করো না যেগুলোর জন্যে তোমার তো বটেই, তোমার ফেসবুক বন্ধুদেরও মানসম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়!

ধরো, বাইরে অনেক রোদ। এখন তুমি যদি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দাও যে, বাইরে তীব্র রোদ, Feeling ঘাম ঘাম, তাহলে কিন্তু বাকিরা তোমাকে নিয়ে

হাসাহাসি করবে। তোমার কোনো কথাকেই তারা আর গুরুত্বের সাথে নেবে না। তাই ফেসবুকে কিছু পোস্ট করার আগে একটু ভেবে নিলেই দেখবে আর কোনো সমস্যা হবে না!

৪. কমেন্ট:

এটাকে বলা যায় সবচেয়ে দরকারি লেসন। আমরা ছোটবেলায় বাবা-মার কাছ থেকে সবাই এই শিক্ষাটা পেয়েছি যে, অপিরিচিত মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়। আদবের সাথে কথা বলতে হয় সবার সাথেই। বাস্তব জগতের এই ভদ্রতাটা কিন্তু ভার্চুয়াল জগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কেউ একজন কিছু একটা পোস্ট করলো, তাতে আক্রমণাত্মক কমেন্ট, গালাগালি করা কিংবা হুমকি দেয়া কিন্তু একেবারেই ঠিক না! তুমি হয়তো ভাবছ এ তো সামান্য ফেসবুক, এখানে একটু মারামারি করলে এমন আর কী হবে। কিন্তু এটা ফেসবুক বলেই তোমাকে খুব সহজে ট্র্যাক করা যাবে, ধরে ফেলা যাবে। তাই কমেন্ট করার সময় একটু ভেবেচিন্তে করলেই দেখবে তোমার ভার্চুয়াল লাইফ কত সুন্দর হয়ে গিয়েছে। আমি জানি, তোমরা যারা এই লেখাটা পড়ছো বা নিয়ে ভিডিওটা দেখেছ তোমরা সবাই ফেসবুকের এসব নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাই আমি আশা করব তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকেও এই লেখাটার মাধ্যমে জানাবে একটা সুন্দর ভার্চুয়াল লাইফ হবার কথকতাগুলো!

তাতে যেটা হবে, সারা বাংলাদেশ একসময় ঠিকভাবে ফেসবুক ব্যবহার করতে শিখবে। আমাদের একটা সুন্দর ভার্চুয়াল লাইফ হবে। হয়তো মার্ক জাকারবার্গের পরের লাইভ ভিডিওতে চিকন পিন নিয়ে নয়, সায়েন্টিফিক দুর্দান্ত কোনো প্রশ্ন করবে বাঙালিরা, আর বিশ্ব অবাক তাকিয়ে বলবে, শাবাশ! বাংলাদেশ!

শিক্ষাজীবনে যে ১০টি কাজ না করলেই নয়

শিক্ষাজীবনে শুধু অন্ধের মত পড়ালেখা করলে যে খুব বেশি দূর যাওয়া যায় না, সেটি আমরা সবাই জানি। পড়ালেখা করে অনেকেই, কিন্তু জীবনে সফলতা পেতে হলে এর পাশাপাশি বেশ কিছু কৌশল জানতে হয়, কিছু কাজে পারদর্শী হতে হয়। তবেই না সফল একজন ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা যায়।

এমন কিছু কাজ আছে, যেগুলো শিক্ষাজীবনের এই দীর্ঘ সময়টায় না করলে বলা যায় শিক্ষাজীবনই বৃথা। এই কাজগুলোয় নিজেকে পারদর্শী করে তুললে শিক্ষা-পরবর্তী জীবনে সাফল্য পেতে কোনো সমস্যাই হবে না। কারণ এগুলো তোমাকে গড়ে তুলবে একজন অভিজ্ঞ কুশলী হিসেবে, আর চাকরিদাতাদের তো এমন একজনকেই দরকার!
আজ এমনই ১০টি কাজের কথা বলব, যেগুলো করলে তুমি খুশি মনে বলতে পারবে, যাক, শিক্ষাজীবনটা বৃথা গেল না তাহলে!

১. Keep the Networking Alive:

নেটওয়ার্কিং বলতে বোঝানো হচ্ছে তুমি যে ক্ষেত্রে কাজ করবে, সে ক্ষেত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচয় রাখা। এতে করে যেকোনো দরকারে তাদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পার তুমি, পরামর্শ পেলে সেটিই বা কম কিসের? ছাত্রজীবন থেকেই নেটওয়ার্কিংটা বাজায় রাখতে হবে। তুমি যে বিষয়ে কাজ করতে চাও, সেই বিষয়ের এক্সপার্টদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করবে। তাহলেই না এগিয়ে যাওয়া যাবে সাফল্যের অভিযাত্রায়।

আমাদের ক্ষুদ্র এ জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটে যায় ছাত্রাবস্থায় এই সময়টাকে কাজে না লাগাতে পারলে বাকি জীবনে হতাশা আর আক্ষেপে কেটে যাবে। সাফল্যের আশাটা ঢেকে যাবে সংশয়ের দোলাচলে। তাই সময় থাকতেই তোমাদের উচিত এ দশটি কাজ সেরে ফেলা। সুন্দর একটি ভবিষ্যতের জন্যে এটুকু তো করাই যায় তাই না?

২. Use Your Digital Profile:

আমাদের সবারই একটা ডিজিটাল প্রোফাইল আছে। সেটি অযথা সেলফি তুলে নষ্ট না করে কাজে লাগাতে হবে। তোমার প্রোফাইল যেন তোমার হয়ে কথা বলে, সেভাবেই সাজাতে হবে সেটি। ধরো, তুমি খুব ভালো এনিমেশনের কাজ পার। তোমার সেরা কিছু কাজ যদি তোমার ডিজিটাল প্রোফাইলে থাকে, তাহলে যেকোনো প্রতিষ্ঠান যারা ভালো এনিমেটর খুঁজছে, তোমার প্রোফাইল দেখেই তোমাকে পছন্দ করে ফেলতে পারে! এভাবে ভবিষ্যতে এই প্রোফাইলই তোমাকে তোমার কর্পোরেট জীবনে সহায়তা করবে।

৩. Learn a New Language:

আধুনিক বিশ্বে সফলতার সূত্র হলো পুরো বিশ্বের সাথে কানেক্টেড থাকা। আর সেটি করতে হলে নিজের মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশি এক দুইটা ভাষা শিখতেই হবে। ইংরেজি তো আবশ্যক, পাশাপাশি তোমার কার্যক্ষেত্র অনুযায়ী আরেকটা ভাষার বেসিক জ্ঞান নিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে তা দারুণ কাজে লাগতে পারে! আর কিছু না হোক, ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হতেই হবে এই ছাত্রজীবনে!

৪. Get Used to the Presentation:

প্রেজেন্টেশন নিয়ে আমাদের ভয়টা পুরনো। ডায়াসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে শ'খানেক প্রেজেন্টেশন দেয়া মানুষটিরও গলা শুকিয়ে যায়, বুক কাঁপে একটু হলেও। এটি থাকবেই। কিন্তু তাই বলে প্রেজেন্টেশন তো খারাপ করা যাবে না! একটি ভালো প্রেজেন্টেশন চাকরিজীবনে সাফল্য পেতে বেশ কাজে দেবে! এজন্যে এটিকে ভয় না পেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে এগিয়ে চললে প্রেজেন্টেশনের ভয়টা আর থাকবে না!

৫. Solve Your Own Problems:

আমাদের আরেকটা সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে যেকোনো সমস্যায় পড়লে সেটির সমাধান না করে সমস্যাটি কে করেছে, কেন হয়েছে এরকম নানাবিধ প্রশ্ন করতে থাকি। কিন্তু কথা হলো যে, সমস্যা যেটাই হোক,

যেভাবেই হোক, সমাধান করতে হবে তোমাকেই। সমস্যা দেখে সেটি নিয়ে প্রশ্ন না করে বুদ্ধিমানের মতো সেটির সমাধান করে ফেললেই জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়।

৬. Start Writing Your Own CV:

আমাদের সমস্যাটা হলো যে, আমরা মনে করি সিভি জিনিসটা পড়ালেখার পাট চুকিয়ে চাকরিতে ঢোকার সময় লিখলেই হয়। এটি একটি ভুল ধারণা। পড়ালেখা শেষ করে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষেই সিভি লেখার অভ্যাস করতে হবে এবং প্রতি সেমিস্টার শেষে নিজের সিভি আপডেট করতে হবে। এতে যে লাভটা হয় পুরো সেমিস্টারে কোনো কাজের কাজ করেছ কি না সেটির প্রমাণ পাবে সিভি আপডেট করার সময়। এভাবে পুরো সেমিস্টারে তোমার কৃত কাজের একটা প্রতিফলন পাবে! তাই আর দেরি না করে ঝটপট শুরু করে দাও সিভি লেখা!

৭. Focus on Corporate Grooming:

কর্পোরেট জগতটা খুব সহজ কোনো জায়গা না। তুমি কাজ করতে না জানলে, পরিস্থিতির সাথে না মানাতে পারলে এখানে আর তোমার জায়গা হবে না। তাই এই জগতের একজন হতে চাইলে আশেপাশে পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। এই পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে মানিয়ে নেয়াটাই হলো গ্রুমিং। কর্পোরেট জগতে টিকে থাকার জন্যে তাই এই কর্পোরেট গ্রুমিং অতি দরকারি।

৮. Take Part in Extra-Curricular Activities:

সহশিক্ষা বা এক্সট্রা কারিকুলার কাজ করতে হবে। সেটি হতে পারে কোনো বিতর্ক প্রতিযোগিতা, হতে পারে কোনো বিজনেস কম্পিটিশন কিংবা MUN। এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করতে চাইলে এগুলোর ব্যবস্থাপনায় কাজ করতে পার তুমি। এছাড়া নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে, তবেই না নিজেকে আদর্শ একজন ছাত্র হিসেবে দেখাতে পারবে!

৯. Find Your Own Mentor:

নিজের একজন মেন্টর বা গুরু খুঁজে নিতে হবে যিনি তোমাকে সাফল্যের পথ দেখাবেন, যার কাজে তুমি হবে অনুপ্রাণিত। এই মেন্টর হতে পারেন

এলাকার বড় ভাই, যিনি পরিশ্রম করে সাফল্যের মুখ দেখেছেন। হতে পারেন কোনো ইন্টারনেট সেলিব্রিটি, যার ভিডিও দেখে তাঁর মতো করে জীবন ধারনের চেষ্টা করছ তুমি! যে-ই হোক নিজের গুরুকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে!

১০. Become a Software Maestro:

সফটওয়্যার নিয়ে ভালো জ্ঞান রাখতে হবে। দক্ষ হতে হবে Powerpoint, Excel ও Word এ। শিক্ষাজীবন থেকে বের হয়ে চাকরির প্রায় সব সেক্টরে এই দক্ষতাটি দারুণ কাজে দেবে। হাজারো চাকরিপ্রার্থীর সাথে তোমার পার্থক্য গড়ে দেবে এই একটি কাজের দক্ষতাই!

প্রতিনিয়ত করে চলেছি যে ৪টি ভুল!

ঈদের ছুটিতে বসে বসে আত্মউন্নয়ন বা Self-development-এর কয়েকটা বই পড়ছিলাম। বইগুলো পড়ে মনে হলো, আমি আসলে প্রতিনিয়ত নিজের জীবনে বেশকিছু ভুল করে যাচ্ছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে, "আরে, এটাই তো ঠিক!" কিন্তু বাস্তবে, এই কাজগুলো আসলে ভুল। অন্তত ৪ রকম ভুল আছে যেগুলো বলতে গেলে অজান্তেই করে ফেলি আমরা সবাই। এসব ভুলের ভুল হবার কারণগুলো জেনে নেয়া দরকার, তাই না?

১. ভাবিয়া বলিও কথা, বলিয়া ভাবিও না:

বেশ কিছুদিন আগে আমরা টেন মিনিট স্কুলের সবাই মিলে কুমিল্লায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। গভীর রাত, আমি আর আমার বন্ধু শুভ একটা বিষয় নিয়ে বেশ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুরু করেছি। খেয়াল করে দেখলাম, আমি আসলে আমার মতামতগুলোকেই বারবার ডিফেন্ড করে যাচ্ছি, আর শুভ তার চিন্তা চেতনার সপক্ষে কথা বলে যাচ্ছে।

মিনিট পেরিয়ে ঘণ্টার কাঁটায় আটকে যায়, আমাদের বিতর্ক আর থামে না। একটা পর্যায়ে এসে দেখা যায়, এই আলোচনায় আমাদের কেউই কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না, পুরো বিতর্কের কোনো ফলাফলই নেই! দৈনন্দিন জীবনের ৪টি ভুলের মধ্যে এটাকে বলা যায় প্রথম ভুল।

এখান থেকে একটা বিষয় খেয়াল করলাম, যে নিজের যুক্তিতে অনড় থেকে অন্যের কথাগুলো ঠিকমত না শুনলে আসলেই কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কোনো ফলাফল পেতে হলে অবশ্যই জানতে হয় অন্যজনের কথা, মন দিয়ে শুনে নিতে হয়। তাই কোনো কথা বলার আগে অন্যরা কি বলছে সেটা শুনে তারপরই কথা বলা উচিত।

২. লেখার আগে একবার ভাবো:

আমাদের লেখালেখির অনেকটাই এখন হয়ে গেছে মোবাইল বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে। সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় লেখালেখি করেই আমরা

ব্যস্ত থাকি। এই সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখার আগে একটা জিনিস মাথায় রাখা খুব জরুরি। সেটা হলো, তুমি যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু লিখছো বা বলছো, তোমার লেখা পড়ে তার মনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা খেয়াল রাখতে হবে।

অতি সম্প্রতি দেখলাম কোনো এক বিউটি কনটেস্টের বিজয়ীকে নিয়ে মানুষের একের পর এক নেগেটিভ কমেন্ট আর পোস্ট। সেগুলোর বেশিরভাগই অশ্রাব্য, তাতে ওই বিজয়ীর কোনো দোষকে নিয়ে সমালোচনার বদলে ঢালাওভাবে গালমন্দ করা হয়েছে বলতে গেলে। এই কাজটা করা উচিত নয়। তুমিই বলো, এই অকারণ অপমান কি মানুষটির জীবনে কোনো ভ্যালু এনে দিয়েছে? তার ভুলগুলো কি শোধরানোর কোনো সুযোগ দেয়া হয়েছে?

একজন মানুষের সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজ সম্মান রয়েছে। তার কোনো ভুল, তাকে নিয়ে কোনো সমস্যা থাকলে সেটি তুমি অবশ্যই বলবে, কিন্তু সেটি হতে হবে সমালোচনার মধ্য দিয়ে। Constructive Criticism বা গঠনমূলক সমালোচনা কর, তাতে কার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অকারণে মানুষকে ট্রল করা বা অপমান করা– এগুলোতে কিন্তু তোমার নিজেরই সম্মানহানি হয়, অন্যের নয়।

৩. হারার আগেই হেরে যাবে না:

আমরা প্রায়ই কোনো কাজ শুরু করার আগেই হা-হুতাশ শুরু করে দেই। টিমমেট নেই, যারা আছে তারা ভালো না, আইডিয়া ভালো না, টাকা নেই, সময় নেই- এরকম হাজারটা অজুহাতের ভিড়ে তোমার কাজের সফলতা কোথায় যে লুকিয়ে যায়! শেষমেষ আর তোমার কাজ করাই হয়ে ওঠে না। এমন অবস্থা হয়, তোমার কাজ শুরু করার আগে কাজে ব্যর্থতার ভীতিই তোমাকে আর এগোতে দেয় না।

এই ভয়টাই ঝেড়ে ফেলে দেয়া দরকার। আমার খুব প্রিয় একজন বক্তা, টনি রবিন্স একটা কথা বলেছিলেন। তাঁর কথা হলো যে, রিসোর্স না থাকাটা কোনো সমস্যা নয়। আমরা যে রিসোর্সফুল নই, সেটাই একটা সমস্যা। আসলেই তাই, সব কাজে একটু রিসোর্সফুল হতে পারলেই সাফল্য আসবে!

৪. জীবনকে উপভোগ কর কাজের মধ্যে:

মৃত্যুশয্যায় যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, তোমার জীবন নিয়ে কি তোমার কোনো আক্ষেপ আছে? বেশিরভাগ উত্তরই হ্যাঁ বোধক আসে। সবাই বলে, তার জীবনে কোনো একটা কাজ না করে যাওয়ার হতাশাটা তার মধ্যে এখনো আছে। এই আক্ষেপ বুকে নিয়েই তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ওই মৃত্যু পথযাত্রীদের আর করার কিছু নেই। কিন্তু তোমার করার আছে অনেক কিছু। এমনভাবে কাজ শুরু কর, যাতে তোমাকেও ওই মানুষগুলোর মতো শেষ সময়ে এসে হা-হুতাশ করতে না হয়। জীবনে কোনো আক্ষেপ রাখার চেষ্টা করবে না। কোনো কাজ করার ইচ্ছা থাকলে শুরু করে দাও কাজ। বাধা বিপত্তি আসতেই পারে, সেগুলো পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়াই তো বীরের লক্ষণ!

একটা বিষয় মাথায় রাখা উচিত আমাদের সবার। আমরা ভুল করি প্রতিনিয়ত, করতেই পারি। কিন্তু এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে গেলে ওই ভুলটা আর কখনোই করি না আমরা। তাই এই শিক্ষা মাথায় রেখে এগিয়ে চলা উচিৎ কোনোরকম আক্ষেপ আর আফসোস ছাড়াই। কারণটা আমরা সবাই জানি–

Life is too short to live with regrets

বিনোদনের ফাঁকে ফোকাস করো নিজের উন্নতি

একটা বড় সাদা কাগজ নাও। একটা বলপয়েন্ট কলম নিয়ে কাগজের ঠিক মাঝখানটায় একটা গোল ডট দাও। এবার চোখের সামনে মেলে ধরো কাগজটা। কী দেখতে পাচ্ছ? চোখের সামনে বারবার ওই কালো ডটটাই পড়ছে না? যেদিক থেকেই তাকাও, কালো ডট তোমার চোখ থেকে কিন্তু সরছেই না!

এর কারণ কি জানো? এর কারণ হলো ফোকাস। বিশাল সাদা কাগজে যখনই কালো একটা ডট আঁকা হলো, তোমার ফোকাস তখন ঠিক সে জায়গাটিতেই পড়ল। আর এজন্যেই চাইলেও আর মাথা থেকে সেই কালো ডটটাকে সরানো যায় না!

আমাদের জীবনে আমরা এমন অনেক কিছুই করি, যেগুলোর কারণে আমাদের সময় নষ্ট হয় ঠিকই, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। কোনো ভ্যালু যোগ হয় না এসব কাজ করে, তবুও নিজের বিনোদন বলো, বা পারিপার্শ্বিক কারণে বলো– কাজগুলো করেই থাকি আমরা। আজ তাই এরকম কিছু কাজ নিয়ে কথা বলব, যেগুলোয় ঠিক জায়গাটায় ফোকাস করতে পারলে নিজের অনেক বেশি উন্নতি করতে পারবে!

১. ফেসবুক:

ফেসবুককে বলা যায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ। সকল বয়সের, সকল মানসিকতার সবার ফোনেই এখন ফেসবুক, তাই এই সামাজিক মাধ্যমটি থেকে বের হয়ে আসার কোনো উপায় নেই বললেই চলে! সমস্যা হলো, প্রতিদিন ফেসবুক তোমার জীবন থেকে বেশ অনেকটা সময় কেড়ে নিচ্ছে অকারণেই!

কার্যকর লেখা বা তথ্যের কথা মানলাম, কিন্তু অযথা চ্যাটিং করা কিংবা অকারণে মানুষের পোস্টে কমেন্ট করে যে সময়টা নষ্ট হচ্ছে, সেটার কী হবে? এই সমস্যার সমাধান করতেও দরকার ফোকাস।

অবাক লাগছে? ভাবছো, ফোকাস করে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে? আসলে ঠিক জায়গায় ফোকাস করতে পারলে ফেসবুক থেকেই অনেক উন্নতি করে নিতে পার নিজের। ফেসবুকে দেখবে অনেক শিক্ষামূলক পেজ রয়েছে, যেখান থেকে শেখা যায় অনেক কিছুই! ফেসবুক যে ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, সেই কমিউনিকেশন নিয়েই না হয় শিখে নিলে নিজের মতো করে! অযথা চ্যাটিংয়ে ফোকাস না করে ঠিক এই শেখার জায়গায় ফোকাস কর, ফেসবুক তোমাকে শেখাবে অনেক কিছুই!

২. ইউটিউব:

খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার আরেকটা সাইট হচ্ছে ইউটিউব। ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে, কিন্তু তবুও ভিডিও দেখার এই সাইটটিতে প্রতিদিন একবারও প্রবেশ করে না এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা। তরুণ প্রজন্ম দিনে এক ঘণ্টা নিশ্চিত করেই ব্যয় করে ইউটিউবের পেছনে। এই সময়টাতে ঠিক দিকে ফোকাস করলে কিন্তু ইউটিউবকেও নিজের কাজে লাগানো যায়!

ইউটিউবে কিন্তু শুধু ফানি বাংলা ভিডিওই নেই। এখানে শেখার মতো অনেক কিছুই আছে, আছে জানার অনেক কিছু। তুমি তোমার ইউটিউবের সময়টা যদি ফোকাস কর এই শেখার দিকে, তাহলেই কিন্তু সেটা অনেক কাজে লেগে যায়! কমিউনিকেশন টিপস কিংবা অন্যান্য স্কিল ডেভলাপমেন্ট নিয়ে কিছু ভিডিও দেখলে, তোমার এক ঘণ্টা মহা কাজে লেগে গেল!

৩. টেলিভিশন:

টিভি দেখে দিনের একটা সময় ব্যয় করে না এমন মানুষ পাওয়া বেশ কঠিন। হ্যাঁ, ফেসবুক-ইউটিউবের যুগে টিভির জনপ্রিয়তা কিছু কমেছে, কিন্তু প্রজন্মের টিভি দেখা কমেনি। দিনের একটা বড় সময় টিভির সামনে কাটালে নিশ্চিত করেই সময় নষ্ট হয়, আর তাই এই সময় নষ্ট হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে টিভির প্রোগ্রামের দিকে ফোকাস করতে পার।

টিভিতে সংবাদ পাঠক পাঠিকারা বলতে গেলে সব থেকে শুদ্ধ করে বাংলা আর ইংরেজি পড়েন। তুমি তাদের বাচনভঙ্গি দেখে সেভাবে কথা বলা শিখতে পার। টিভিতে রান্নার অনুষ্ঠান দেখে রান্নাটা না হয় একটু শিখে নিলে!

ইংরেজি সিনেমা দেখে ইংরেজি উচ্চারণের দক্ষতাও বাড়িয়ে নিতে পার। দরকার শুধু বিনোদনের পাশাপাশি এই শেখার দিকটায় ফোকাস করা!

৪. ট্রাফিক জ্যাম:

সূর্য যেদিক দিয়েই উঠুক, দিনের শেষে রাত আসুক বা না আসুক, ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম থাকবেই– এ যেন এক অমোঘ সত্য। আর এই সত্যকে মেনে নিয়ে জ্যামে বসে বিরক্ত না হয়ে আর জ্যামের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার না করে সময়টা কাজে লাগানোর দিকে ফোকাস করলে কিন্তু অনেক কাজে লাগে সেটা!

এক কাজ করতে পারো। আগের রাতেই ফোনে ইউটিউবে পডকাস্ট সেভ করে রাখতে পার। ডাউনলোড করে নিতে পার অডিওবুক। সত্যিকারের বই পড়ার সময় না থাক, অডিওবুক কানে একটা হেডফোন লাগিয়েই শুনে নিতে পার! তাতে সময়ও বাঁচল, বই পড়াটাও হলো!

আমাদের জীবনে সময় নষ্ট করে এমন বিষয়ের কমতি নেই। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে থেকে যদি আমরা শেখার বিষয়গুলো বের করে আনতে পারি, সেখানেই ফোকাস করি, তাহলে কিন্তু এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে গেল! বিনোদনও হলো, সাথে শেখাও!

ভোকাবুলারি জয়ের ৫টি কৌশল

বিভিন্ন ভর্তিপরীক্ষা থেকে শুর করে জীবনের নানা স্তরে ভালো করার ক্ষেত্রে প্রায়ই কাল হয়ে দাঁড়ায় ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার ভালো না থাকাটা। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে, আমরা ভোকাবুলারি মুখস্থ করে কিছুদিন পরেই আবার ভুলে যাই। এজন্যে ভোকাবুলারিই অনেকসময় আমাদের সফলতা অর্জনের শত্রু হয়ে পড়ে!

একটা ঘটনা বলি। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, ইয়া মোটা একটা বই মুখস্থ করেছিলাম। একগাদা শব্দ, সব আমার মুখস্থ! কিন্তু হলো কী, যেই না ভর্তি পরীক্ষা শেষ হলো, হঠাৎ দেখলাম সেগুলো আর আমার মাথায় নেই! বেমালুম ভুলে গিয়েছি প্রায় সবগুলোই!

এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কয়েকটা টিপস ফলো করতে পার। চলো দেখে আসি কেমন সেই টিপসঃ

১. আমরা যখন প্রায় একই বানান বা উচ্চারণের শব্দ বারবার দেখি,আমরা গুলিয়ে ফেলি কোন্‌টি আসলে কোন শব্দের অর্থ। এ জন্য শব্দ মুখস্থ করে পড়ার সময় একটু উল্টেপাল্টে নিতে হবে। প্রথমে না হয় A দিয়ে শুরু এমন একটা শব্দ পড়লে, আর তারপর A যুক্তশব্দ না পড়ে Z দিয়ে শুরু এমন আরেকটা শব্দ পড়ে ফেললে! তাতে আর এ সমস্যাটা হবে না।

২. যদি এমন হয় যে, তুমি একটা শব্দ বেশ কয়েকবার পড়েছ, কিন্তু এখন আর সেটা মনে পড়ছে না। তখন কী করবে? এর প্রস্তুতি নিতে হবে আগেই। কঠিন শব্দগুলো পড়ার সাথে সাথে মনের মধ্যে মজার কোন বাক্য বানিয়ে নিতে হবে ওই শব্দটি দিয়ে। তাতে শব্দার্থ ভুলে গেলেও, বাক্যটি কিন্তু ঠিকই মনে থাকবে! লাইভ ভিডিওটি থেকে দেখে নাও উদাহরণগুলোও!

৩. একই অর্থের অনেকগুলো শব্দ থাকতে পারে, আর সেগুলো প্রায়ই নানা সমস্যার সৃষ্টি করে! এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় খুব সহজ। একটা শব্দ পড়ার সময় চটপট তার Synonym গুলোও পড়ে ফেলো! তাতে একটির জায়গায় অনেকগুলো শব্দ একেবারে শেখা হয়ে গেল!

৪. আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে আমরা শব্দগুলো মুখস্থ করি এবং কিছুদিন পরই আবার ভুলে যাই। এর সমাধান হচ্ছে Read-Memorize-Repeat. অর্থাৎ পড়ে মুখস্থ করে আবারো প্রাকটিস করতে হবে। এ নিয়ে আরো জানতে দেখে ফেলো লাইভ ভিডিওটা!

৫. তোমার যে মোবাইল ফোনটি ফেসবুক আর ইন্সটাগ্রামে চষে বেড়ায়, সেই মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করেই কিন্তু উন্নত করতে পার ভোকাবুলারি! আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট হয় ট্রাফিক জ্যামে। আমরা এই জ্যামে বসে কিন্তু ফোনে ভোকাবুলারি অ্যাপ ব্যবহার করে শিখতে পারি ভোকাবুলারি! এছাড়াও আমাদের 10 Minute School এর Surprise সব সেকশন থেকেও তুমি শিখে নিতে পারো ভোকাবুলারি!

একটুখানি চেষ্টা আর পরিশ্রম করলেই কিন্তু আয়ত্তে আনা ভোকাবুলারির সাতসতেরো! দরকার শুধু সেই মনোযোগ আর নতুন কিছু শেখার আগ্রহ!

অপরিচিতের সাথে কিভাবে ফোনে কথা বলবো?

Cold calling বলে ইংরেজিতে একটা কথা আছে। না, এর সাথে ঠান্ডা কথার কোনো সম্পর্ক নেই, ঠান্ডা কথা আবার কী? Cold calling শব্দটার মানে হলো অপরিচিত কারো সাথে প্রথমবারের মতো কথা বলা। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, এগুলো নিয়ে লেখার কী দরকার?

সত্যিটা হলো, এসব নিয়েই জানা দরকার সবার। আমরা ইন্টারনেটে শত শত বস্নগ পড়ি, ইউটিউবে ট্রেন্ডি ভিডিও দেখি। সেখানে শেখানো হয় কীভাবে সুন্দর করে কথা বলে মেয়েদের ইম্প্রেস করতে হয়, কোন স্টাইল ফলো করতে হয় আরো কত কী। অথচ কোনো অফিশিয়াল আলোচনার ক্ষেত্রে সামনাসামনি দেখা সাক্ষাতের থেকে ফোনেই বেশি কথাবার্তা হয়! তাই অপরিচিতের সাথে কীভাবে কথা বলবে, সেটা শিখে নেয়া জরুরী।

প্রথমবার কাউকে ফোন দেয়ার কিছু নিয়ম রয়েছে। এগুলো মেনে চললে ফোনের ওপাশের মানুষটি ভাববে তুমি একশ ভাগ প্রফেশনাল– আর এতে সুসম্পর্কও গড়ে উঠবে!

১. নিজের পরিচয় জানাও আগেঃ

ফোন করলে, ওপাশ থেকে পরিচয় জানতে চাইলো, তুমি বলে দিলে তোমার প্রিয় ডাকনামটি, পাড়াতো ছোটবোনটি তোমাকে যে নামে ডাকে– তাহলে কি ব্যপারটা প্রফেশনাল হলো? একদমই না। তুমি যে প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ কর, অথবা সে মানুষটি যে প্রতিষ্ঠানের নাম শুনে তোমার সাথে কথা বলতে রাজি হয়েছে, তুমি সে নামটাই বলো। "ভাইয়া, আমি টেন মিনিট স্কুল থেকে আয়মান বলছি"। এখন শুনতে ভালো লাগছে না?

আরেকটা বিষয়। তুমি যাকে কল করছ, এটা জেনেই কল করছ যে এই মানুষটি আসলে কে। তাই ফোন দিয়েই "ভাই, আপনি কে বলছেন?" বলে

সময় নষ্ট করবে না। এতে যাকে কল করছ তিনি নিজেও মহা বিরক্ত হয়ে উঠতে পারেন। কুশলাদি বিনিময় করলে ভালো হয় এ জায়গাটায়।

২. নিশ্চিত হয়ে নাও ফোনের ওপাশের মানুষটি ব্যস্ত কি না:

তুমি ফোন দিয়েছ দরকারি কাজে। উনি ব্যস্ত থাকলেও হয়তো ফোনের খাতিরে দু'একটা কথা বলে দিতে পারেন, কিন্তু তোমার দায়িত্বই বলা চলে, যে উনি ব্যস্ত থাকলে পরে একসময় ফোন দেয়া।

এভাবে বলতে পার, "আমি জানি আপনি অনেক ব্যস্ত একজন মানুষ, আপনার কি কথা বলার দুই মিনিট সময় হবে?" এতে দুটো বিষয় হচ্ছে। উনি ব্যস্ত না থাকলেও তোমার কথায় অনেক খুশি হচ্ছেন, তোমার কথায় তাঁর নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে তোমার কাছে। এই সুন্দর ব্যবহারটুকু অনেক কাজে দেবে ভবিষ্যতে।

৩. কথা শেষ মানে পরিচয় শেষ না:

কাজের কথা বলা শেষ। এখন কী তুমি ফোন রেখে দেবে? মোটেও না। তোমার কাজের একটা Call to action রেডি রাখতে হবে না? জেনে নাও এরপরে তাঁর সাথে কবে কথা বলা যাবে। কোথায় দেখা করা যাবে। ইমেইল আইডি নিয়ে রাখবে, হাল আমলের ফেসবুক আইডি জানা থাকলে তো আরো ভালো!

৪. বারবার কল নয়:

ধরো তুমি একজন মানুষকে ফোন দিলে। সে ফোনটা রিসিভ করল না। তুমি কি তাকে বারবার ফোন দিয়ে জ্বালাতে থাকবে? একটু পর কল করতে থাকবে? মোটেও না। এটা খুব খারাপ দেখায়, মানুষটিও বারবার কলে বিরক্ত হয়।

এক্ষেত্রে তুমি যেটা করতে পারো, সেটা হচ্ছে উনার ফোনে একটা টেক্সট করে রাখতে পার। ফেসবুক–মেসেঞ্জারের যুগে মেসেজিং করাই হয় না আর তেমন। কিন্তু দেখ, বারবার কল না দিয়ে ফোনে একটা ছোট্ট টেক্সট করে রাখাটা কিন্তু অনেক কাজের হবে।

ধরো তুমি টেক্সট দিলে, যে তুমি একটা স্কুলের ডিবেট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, ক্লাবের ইভেন্ট নিয়ে তুমি কথা বলতে চাও। উনি কখন ফ্রি জানলে তুমি কল দেবে। এখানে দুটো বিষয় হয়। এক হলো যে, মানুষটি অর্ধেক জেনেই গেল কেন তুমি কথা বলতে চাও, এতে তোমার সময় বাঁচল। আরেকটা বিষয় হলো যে উনি তোমার জন্য সময় বের করে রাখতে পারবেন টেক্সট দেখে।

বাংলায় একটা কথা আছে, জানো তো? পাত্তা না দিলে পাত্তা আদায় করে নিতে হয়। সেজন্য যদি কখনো দেখ যে কেউ তোমার কল রিসিভ করছে না বা ঠিকঠাক কথা হচ্ছে না, তাহলে বুঝবে শুরুর দিকের নিয়মগুলোতে কোনো না কোনো ভুল হয়েছে! শুধরে নিয়ে আবার কথা শুরু কর, দেখবে সুন্দর একটা প্রফেশনাল সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে!

সালাম দেয়া এবং ভালো গুণের প্রশংসা করা

কয়েকদিন আগের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বের হচ্ছি, হঠাৎ দেখি বয়োজ্যেষ্ঠ একজন মানুষ, গালভরা দাড়ি, যিনি আমার পাশেই নামাজ পড়েছেন– এসে সুন্দর করে একটা সালাম দিলেন আমাকে। একটু চমকে গেলাম, ভাবলাম যে সাধারণত ছোটরা বড়দের সালাম দেয়, আর এই সিনিয়র মানুষটি আমাকে সালাম দিলেন! উনি তো কোনো টিচারও হতে পারেন!

আমার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা দেখে মানুষটা মুচকি হাসলেন। বললেন, “অবাক হচ্ছ, বাবা? এ আর এমন কী, প্রায় সবাই অবাক হয়ে তাকায়!” আমি আমতা আমতা করে বললাম, আসলে এমন তো কখন হয়নি আমার সাথে, তাই একটু চমকে গেছি। ভদ্রলোক বললেন, যে এই সালাম দেয়ার কাজটা শুরুর পর অনেকেই অবাক হতো। উনি সিনিয়র মানুষ, তাই অবাক হওয়ার মাত্রাটা একটু বেশিই হতো। মজার ব্যাপার হলো, এই বিষয়টা বুঝতে পেরে তিনি বেশি করে সালাম দেয়া শুরু করেন! নিজের থেকে ছোটদের সালাম দিতেন, নিজের স্টুডেন্ট দেখলেও সালাম দিতেন।

এ পর্যায়ে বুঝলাম যে ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আরো ভালো লাগল, একজন শিক্ষক এমন একটা দারুণ কাজ করে যাচ্ছেন! কথায় কথায় তিনি জানালেন, “কাউকে যদি অবাক করতে চাও, তাহলে এই কাজটা করে দেখতে পার। মানুষটা অবাক হবে, পাশাপাশি তার মনটাও ভালো হয়ে যাবে!”

আমার কাছে একটু অবাক লাগছিল, যে একটা সালাম কী করে মন ভালো করে দিতে পারে? আমি নিজেই তখন সবাইকে সালাম দেয়া শুরু করলাম। বাসার দারোয়ানকে দেখলে সালাম দিতাম, ড্রাইভারের সাথে দেখা হলে সালাম দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতাম, দোকানদার মামার কাছ থেকেও শুনতাম কেমন আছেন তিনি। এখানে যেটা হতো, এই সালাম বা

কুশলাদির কোনোটাই আশা করতেন না তারা। এজন্য যখন তাদেরকে এগুলো দেয়া হতো, অন্যরকম একটা আনন্দ পেতেন কর্মজীবী মানুষগুলো। আসলেই মনটা ভালো হতো তাদের।

বিদেশে যখন গিয়েছিলাম, তখন দেখেছি রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসার সময়ে, মানুষেরা একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে হাসি দেয় একটা। মুচকি হাসি, কিন্তু অপরিচিতজনের সেই হাসিতে মনটা একটু হলেও ভালো হয়ে যায়! বাংলাদেশে আমি চেষ্টা করেছিলাম এরকম, মানুষজন এমন ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছে, যে বুঝেছি এদেশে আপাতত হাসি থেরাপি কাজে লাগবে না। তাই সালামই সই!

মানুষের দিনটাকেই সুন্দর করে দেয়ার আরো কিছু টিপস দেয়া যেতে পারে এখানে।

প্রশংসা করাঃ

"আরে! তোর কালকের স্ট্যাটাসটা তো অসাধারণ ছিল!"
"দোস্ত, ছবি যেইটা তুলেছিলি গতকাল, অন্য লেভেলের হয়েছে, সত্যি!"
"তোর এত সুন্দর গানের গলা, মাশাআল্লাহ!"
এই ধরনের প্রশংসা করতে কখনো দ্বিধা করবে না। কারো প্রতিভা থাকলে তার প্রশংসা করলে সে আরো বেশি উদ্দীপনা পাবে এগিয়ে যাবার, তার পরের কাজগুলো আরো ভালো হবে!

গুণের কদর করাঃ

"তুই না থাকলে আজকে ক্রিকেট ম্যাচটা হেওে যেতে হতো!"
"রাত তিনটায় তুই যদি রক্ত দিতে না আসতি, কী যে হতো!"

মানুষের অনেক মানবীয় গুণাবলী আছে। সেগুলোর যথাযত মূল্যায়ণ করলে তারা অনেক বেশি সুখী হবে। তোমার কোনো বন্ধু যদি অনেক কষ্টে কোনো কাজ কওে, সেই গুণের কদও করবে, দেখবে তারা আরো বেশি সহায়তা করবে পরে!

অনুপ্রেরণা দেয়াঃ

"দোস্ত, কোনো চিন্তা করিস না। আমরা আছি না? সব ঠিক হয়ে যাবে"।

"যেকোন সমস্যায় খালি আমাকে একটা কল দিবি। সব মুশকিল আসান করে দেব!"

মানুষের অনেক রকম সমস্যা চলতে পারে, ব্যাড প্যাচ যেতে পারে। এই সময়টায় বন্ধু বা পরিচিত একজন হিসেবে তোমার প্রথম কাজ হবে তাদের সহায়তা করা। তাদের সমস্যায় বন্ধু হিসেবে এগিয়ে যাওয়া, বিভিন্ন কাজ করে দিয়ে তাদের সময়টা যাতে আরেকটু ভালো হয় সে খেয়াল রাখা। তাদের জন্যে অনুপ্রেরণার কারণ হও, তারা খুশি হবেই!

সমাদর করাঃ

" মা, আজকের কাচ্চিটা যা হয়েছে না!"
" আব্বু, তোমার এই গিফ্‌টটা ফাটাফাটি হয়েছে!"

মানুষ মানুষের জন্যে অনেক কিছুই করে। কিন্তু সবকিছুকে ঠিকভাবে সমাদর করি না আমরা অনেকেই। তাতে মানুষটি মনে একটু হলেও কষ্ট পায়, মনে করে তার এই পরিশ্রম বুঝি বৃথা গেল! তাই সব কাজকে সমাদর করবে। ধন্যবাদ দেবে, এপ্রিশিয়েট করবে। তাহলে মানুষগুলো খুশি থাকবে।

এই কাজগুলো কিন্তু রাতারাতি একদিনে হয় না। এগুলোর জন্য গড়ে তুলতে হয় সু-অভ্যাস। তাই, সুখে থাক, সুখে রাখ- এ লক্ষ্যে অভ্যাসগুলো রপ্ত করে ফেল, দেখবে নিজেরই ভালো লাগবে!

“তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না” থেকে আত্মরক্ষার কৌশল

গতানুগতিক পড়ালেখার বাইরে নতুন কিছু করতে গেলেই অনেকগুলো বাধার মুখে পড়তে হয়। নিজের বাসায় পরিবারের বাধা তো আছেই, বাইরের অনেকগুলো মানুষের কথা শুনতে হয়। পদে পদে এসব বাধা জয় করে নিজের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়াটা বেশ কঠিন মনে হয় তখন। দেখে আসা যাক কেমন সে বাধা!

১. পরিবারের আপত্তিঃ

বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবারের সন্তানদের কাছে আশা থাকে যে ছেলে বড় হয়ে পড়ালেখা করে ভালো চাকরি করবে, অর্থ উপার্জন করে পরিবারের দেখভাল করবে। সন্তান বড় হয়ে যখনই অন্যরকম কিছু করতে যায়, তখনই শুরু হয় বিভিন্ন রকম বাধা! ধরো তুমি নতুন কিছু করলে। নতুন একটা উদ্যোগ শুরু করলে। পরিবার থেকে বলবে,

“এসব করে কোনো লাভ আছে? ফিউচার কী এসবের?”
“তুই যে এগুলো করিস, মানুষ শুনলে কী বলবে?”
“তোর মামা-চাচার ছেলেমেয়েরা কত বড় বড় জায়গায় আছে, তোর কী হবে?”

এত শত প্রশ্নের পর যখন তোমার উদ্যোগটা একটু হলেও দাঁড়িয়ে যাবে, তখন শুরু হবে আরেক সমস্যা। এবার বাসা থেকে শুরু করবে তোমার পড়ালেখা নিয়ে কথা বলা।

“পাশের বাড়ির আপার দুই ছেলেই দেখ মেডিকেলে। আর তুই? কী সব করে বেড়াস!”
“ এই যে এসব করিস, নিজের সিজিপিএর দিকে একবার তাকিয়েছিস?”

এমনকি তুমি তোমার কাজ নিয়ে জনপ্রিয় হলেও তাঁদের হতাশা কাটবে না। তারা বারংবার প্রশ্ন তুলেই যাবেন!

২. পাশের বাসার আন্টি:

শুধু প্রতিবেশীরাই নয়, এই শ্রেণিতে পড়ে তোমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়রাও। এদের খোঁজ পাওয়া যায় না কখনোই, শুধু তোমার পরীক্ষার রেজাল্টের সময় এদেরকে দেখা যায়। আর দেখা যায় তোমার কোনো নতুন উদ্যোগের শুরুতেই বাগড়া বাধাতে।

"ভাবী, আপনার ছেলে পড়ালেখা বাদ দিয়ে এসব কী করছে? মানা করেন, বখে যাবে!"
"আপা, সময় থাকতে ছেলেকে পড়তে বসান। রেজাল্ট কেমন হচ্ছে ওর?"
"আমার এক পরিচিত আপার ছেলেও এইসব কাজ করে বেড়াতো। এখন ঘুরে বেড়ায়, বেকার। বুঝলেন তো ভাবী?"

এত শত কথার ভিড়ে পরিবারের চাপটা খুব করে ঘাড়ের উপরে আসে, সে আর নামতেই চায় না!
লোকে কী ভাবলো!
আরেকটা হচ্ছে তোমার নিজের ভয়। পরিবারের এত শত কথা শোনার পর তোমার নিজেরও মনে হয় এটাই মাথায় আসে, যে তুমি যে কাজটা করছ সেটা ঠিক হচ্ছে তো? যদি এই কাজে ব্যর্থ হও, তাহলে বাসায় কী বলবে? এই ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে কাজ করাটা ঠিক উচিত হবে না হয়তো! সাথে বাসায় বলা কথাগুলো মাথায় বাজতে থাকে—

"এইসব করতে থাকলে বিয়ে দিয়ে দিব একেবারে। বউ-সংসার চালাতে গেলে সব পাগলামি যাবে!"
"চাকরি-বাকরি তো হবে না, এইসব করে আর কতদিন চলবা?"
"দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষলাম এতদিন। এই ছেলে তো আমার মানসম্মান নষ্ট করবে পুরা!"

এসব কথার পরে তোমার নিজের ভেতরের উদ্যমি মনটা একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, শোকাহত হবে।

৩. সহজ সমাধান:

একটা বিষয় সব সময় মাথায় রাখবে। তুমি একটা সমাজে বাস কর, তাই সমাজকে বাদ দিয়ে তুমি চলতে পার না। আর সমাজের সাথে চলতে

থাকলে সমাজের অদ্ভুত মানুষগুলোর উদ্ভট চাপ তোমার উদ্যোগকে বাধা দিতেই থাকবে। তোমার হাতে এখন দুটো অপশন খোলা:

ক. সমাজের চাপে একদম সংকুচিত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়া।
খ. সমাজের চাপকে থোড়াই কেয়ার করে নিজের কাজ করে যাওয়া।

এখন তুমিই বলো, নিজের স্বপ্নকে পাথরচাপা দিয়ে কি তুমি প্রথম অপশনটি বেছে নিতে পারবে? তাহলে তোমার সাথে ইন্টারনেটের ওই বিখ্যাত মিমটির পার্থক্য কী? সেখানে বলা হয়, "বেশিরভাগ মানুষের জীবন তিন ধাপে শেষ হয়, জন্মানো- লোকে কী বলে এই ভয়ে কিছু না করা– মৃত্যু!"

নতুন কোনো কিছু শুরু করলে সমালোচনা আসবেই। আসবে হতাশা, আসবে ব্যর্থতা। তাই বলে তুমি সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবে? হাল ছেড়ে দেবে? নাকি দ্বিতীয় অপশনের মতো সব হতাশা আর সমালোচনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাজে লেগে পড়বে নতুন করে?

পাশের বাসার আন্টি কেন তোমার ক্যারিয়ারের দিকপ্রান্তে থাকবে? তুমিই গড়বে তোমার ভাগ্য। আর এজন্য তোমাকেই নিতে হবে জীবনের সিদ্ধান্ত গুলো। নিজেই ভাবো জীবন নিয়ে কী করবে। যেখানে আগ্রহ, সেখানে কাজ কর। যা নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছা করে, সেটা নিয়েই এগোও। ইচ্ছাশক্তি থাকলে তোমাকে আটকাবে কে?

একটি কমন অভ্যাস

অভ্যাস না বলে এটিকে আসলে বদঅভ্যাস বলাই ভালো। এটি হলো, সবরকম ব্যর্থতার পেছনে আমরা ভাগ্যকে দায়ী করতে থাকি। পরীক্ষায় ফেল করলে, বলে বসলাম "ভাগ্যে ছিল না।" বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ হলো না, অজুহাত তৈরি "ভাগ্য সহায় হলো না।" চাকরির ইন্টারভিউতে বাদ হয়ে গেলে, তখনও সেই ভাগ্যকেই আসামি করতে হচ্ছে।

সত্যি বলতে কী, সবকিছুতে এভাবে ভাগ্যের দোষ দেবার কোনো কারণই নেই। Luck, Fate এগুলো আমাদের জীবনের অংশ বটে, কিন্তু তুমি নিজেই পারো তোমার ভাগ্য বদলাতে। তুমি চাইলেই সাফল্য আসবে, তখন আর ভাগ্যের নাম নিতেও হবে না। নিজের সাফল্য তাই তোমার নিজের কাছেই।

নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে চাইলে কিছু ধাপ ফলো করে দেখতে পার। আমার নিজের জীবনে এই ধাপগুলো বেশ কাজে লেগেছে, আশা করছি তোমারও অনেক উপকারে আসবে!

ধাপ-১

শুরুটা হোক নিজের একটা লক্ষ্য ঠিক করে ফেলা দিয়ে। হ্যাঁ, সব মানুষ সমান নয়, সবার কর্মক্ষমতা বা মেধা সমান নয়। তাই নিজের সাম্যর্থ অনুযায়ী ঠিক করে ফেলো তুমি জীবন নিয়ে কী করতে চাও, তাহলেই সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারবে। চেষ্টা করবে নিজের লক্ষ্যটি নির্দিষ্ট করে সে অনুযায়ী কাজ করে যেতে।

ধাপ-২

এবার চেষ্টা কর লক্ষ্য অর্জনের পথে যে ধাপগুলো পার করবে, সেগুলো একটি একটি করে কাগজে টুকে রাখার। তাহলে পেছনে ফিরে তাকালে তোমার জীবনের ভুলগুলো চোখে পড়বে, তোমার অসঙ্গতিগুলোকে ঠিক করে আগের থেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে এগিয়ে যেতে পারবে।

ধাপ-৩

অঙ্গীকারবদ্ধ থাকো, যে ধরনের কাজই কর না কেন। তুমি যদি তোমার কাজের প্রতি আগ্রহী হও, সেটি নিয়ে সফল হতে চাও, তবে সবসময় অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যেতে হবে।

ধাপ-৪

ভাগ্যকে দোষারোপ করবে না, একেবারেই না। ভাগ্য তোমার সাথে থাকবে তখনই, যখন তুমি নিজ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে কাজ করবে। কথায় বলে না, "Fortune Favours the Brave"?
তাই বীরত্বের সাথে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলে ভাগ্য এভাবেই তোমার সহায় হবে।

ধাপ-৫

নিজের ভুলকে স্বীকার করাটা খুব বেশি দরকার। তুমি মানুষ, কোনো মেশিন নও যে নিখুঁতভাবে সব কাজ করবে। তোমার ভুল হতেই পারে, আর তাই সেগুলোকে অস্বীকার করবে না। নিজের ভুল স্বীকার করে সেগুলো ভবিষ্যতে আর যাতে না হয়, সেই ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

ধাপ-৬

সময়ের সদ্ব্যবহার করতেই হবে। একজন সফল মানুষের জীবনে সময়ানুবর্তিতা খুবই দরকারি একটা কাজ। ধরো তুমি সময়ের কাজ সময়ে করলে না, ফেলে রাখলে। তাহলে পরের কাজগুলোর সাথে নতুন এই কাজটাও এসে যোগ হবে, আর তাতে পুরনো এই কাজটা আর কখনোই করার সময় হবে না। এজন্য সময়কে ঠিকভাবে কাজে লাগাও!

ধাপ-৭

আত্মনির্ভরশীল হও। পরনির্ভরশীলতা সাফল্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কারো উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে তুমি সাফল্য পেলেও সেটি তোমার একার হবে না, আর তাকে আদতে সাফল্য বলা যায় কি না তাতে তুমি নিজেও সন্দিহান হয়ে পড়বে। তাই নিজের উপর নির্ভরশীল হবার চেষ্টা কর।

ধাপ-৮

জীবনে চলার পথে যেকোনো সময়, যেকোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় পরামর্শ নিতে লজ্জার বালাই করবে না। পরামর্শ পেতে পার তোমার চরম শত্রুর কাছ থেকেও, পরামর্শ পেতে পার একেবারে ক্ষুদ্র কোনো ব্যক্তির কাছ থেকেও, তাই কখনো পরামর্শকে অগ্রাহ্য করবে না। মনে রাখবে, কারো পরামর্শই ফেলনা নয়, তাই সফল জীবন গড়তে এগুলোর অনেক দরকার রয়েছে।

সফলতা পাওয়া খুব সহজ কোনো কাজ নয়। তাই বলে ভাগ্যের হাতে সবকিছু সঁপে দেয়াটা হবে চূড়ান্ত বোকামির পরিচয়! নিজের মতো করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করে গেলে ভাগ্যও তোমায় সঙ্গ দেবে, দিতেই হবে!

পরিশ্রমকে হ্যাঁ বলো

আমাদের জীবনে ব্যর্থতা আসার অন্যতম একটা কারণ কি জানো? আমরা আসলে পরিশ্রম করতে চাই না। আমাদের সবসময় লক্ষ্য থাকে কীভাবে সহজে, শর্টকাটের সাহায্য নিয়ে হলেও কোনো কাজ শেষ করে ফেলতে পারবো। পরিশ্রম করতে আমাদের ইচ্ছেটা থাকে না, খুঁজতে থাকি এমন কোনো উপায় যাতে একফোঁটা ঘাম না ফেলেই কাজ করে নিতে পারব। সত্যি বলতে কি, এমন মানসিকতা প্রায়শই ব্যর্থতার জন্ম দেয়। পরিশ্রম দেখলে এই যে আমরা উল্টো পথে দৌড় দেই, এখান থেকে ফিরে আসতে পারলে কিন্তু সাফল্যের দেখাও মিলবে। তাই পরিশ্রমের রাস্তায় যাওয়ার চিন্তা করতে হবে সবাইকে। প্রশ্ন আসতেই পারে, পরিশ্রমী হতে হলে কী করতে হবে? এ প্রশ্নেরও উত্তর আছে। কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে পরিশ্রমী না হোক সেটি হবার পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

১. নিজের কাজগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নাওঃ

পরিশ্রম করতে আমাদের আলসেমির একটা কারণ হলো বড় বড় কাজ করতে গেলে অনেক বেশি ক্লান্তি চলে আসে। কাজের বহর দেখলেই হতাশ হয়ে যেতে হয় কাজ করার ইচ্ছেই করে না। পরিশ্রম তো অনেক দূরের কথা। তাই যে কাজই হোক, সেগুলোকে যদি আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে শেষ করি, তাহলে একদিকে যেমন দ্রুতগতিতে কাজ এগোবে, অন্যদিকে পরিশ্রম করতেও ক্লান্তি লাগবে না।

২. নিজের লক্ষ্য অর্জনে ফোকাস করোঃ

অন্যের লক্ষ্য কেমন, তারা লক্ষ্য অর্জনে কতদূর গেছে সেদিকে তাকিয়ে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। বড়জোর অন্যের লক্ষ্যপূরণ থেকে উদ্দীপনা নিতে পার তুমি যে, ও পারলে আমি কেন নয়? কিন্তু তুমি তোমার লক্ষ্যে অবিচল থাকবে। লক্ষ্য নিশ্চিত না থাকলে পরিশ্রমে আগ্রহ মেলে না। আর তাই নিজের লক্ষ্যটি ঠিকঠাক রাখো, এগিয়ে চলো পরিশ্রম করে।

৩. ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখোঃ

তোমার জীবনে যেকোনো কাজে হতাশা আসতেই পারে। ভেঙে পড়াটা অস্বাভাবিক না তাই। কিন্তু সেজন্যে পরিশ্রম করা ছেড়ে দেবার কিন্তু কোনো কারণ নেই! ইতিবাচক মনোভাব রাখার চেষ্টা করবে সবসময়। মনে রাখবে, হাজারো ব্যর্থতার পর যে সাফল্য আসে, সেটির মূল্য সবচেয়ে বেশি।

৪. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখোঃ

প্রায়ই দেখা যায় যে খুব পরিশ্রমী একজন মানুষের জীবনে বড় রকমের হতাশা যে, নেমে এসেছে। এমন সে হতাশা, মানুষটিকে ভেঙে দিয়েছে ভেতর থেকে। কেন জানো? কারণ তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। যত বড় আঘাতই আসুক না কেন, নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকলে সেগুলোকে মোকাবেলা করা যাবে ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রম দিয়ে।

৫. পরিশ্রমী মানুষের সাথে মেশোঃ

আমি একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি। তা হলো, তুমি যে ধরনের মানুষদের সাথে বেশি চলাফেরা কর, যাদের সাথে বেশি মেশা হয় তোমার, সেই মানুষগুলোর আচার আচরণ, চরিত্রগুলো খানিকটা হলেও তোমার মধ্যে বিরাজ করে। এজন্যে দেখা যায় খুব জ্ঞানী কোনো মানুষের শিষ্যদের অনেকেই জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়।

ইংরেজি ভাষা চর্চা করতে আমাদের নতুন গ্রুপ- 10 Minute School English Language Club-এ যোগদান করতে পারো! এখানেও ব্যাপারটা একই রকম। চেষ্টা কর পরিশ্রমী মানুষদের সাথে পরিচিত হবার তাদের সান্নিধ্য পাবার। এতে করে তোমার নিজের মধ্যেও এক ধরনের পরিশ্রমী মনোভাব চলে আসবে। তুমিও হতে চাইবে তাদের মতো পরিশ্রমী। এভাবে পরিশ্রমের ভূতটাও তোমার মাথায় চেপে বসবে।
বর্তমান যুগ হলো মহা ব্যস্ততার যুগ আবেগের দান নেই এখানে। তাই পরিশ্রমীরাই সফল হবে এই যুগে। তাই সফলতা পেতে হলে অবশ্যই তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অনুশীলন করে যেতে হবে। তবেই পাবে সাফল্যের দেখা!

প্রতিযোগিতায় যে গুণগুলো থাকা প্রয়োজন

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটা অন্য সব সময়ের থেকে আলাদা। নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধবীর দেখা, আড্ডা, নিজের ক্যারিয়ার গড়ার ভাবনা থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছুর শুরুটা হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার শুরুরটাও এই বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই হয়। এগুলো আবার স্কুল কলেজের মতো নয়, এসবের কোনো কোনোটায় সাফল্য বদলে দিতে পারে ক্যারিয়ারের গতিপথ!

বিভিন্ন বিজনেস কম্পিটিশন রয়েছে, যেগুলোয় সাফল্য পেলে নামজাদা সব প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্ন করা যায়, অনেক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ মেলে। সাথে থাকে বড় অঙ্কের প্রাইজমানি, আর হয় অভিজ্ঞতা। এছাড়াও MUN বা Debate এর মতো প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে একদিকে যেমন নিজের Public Speaking Skill বাড়তে থাকে আবার অন্যদিকে নিজের একটা পরিচিতিও হয়, যা ক্যারিয়ারে অনেক কাজে লাগে।

যে কোনো প্রতিযোগিতাই হোক না কেন, এগুলোর জন্যে খুব দরকারি কিছু জ্ঞান মাথায় রাখতে হয়। যেকোন প্রতিযোগিতা, যেখানে কথা বলা বা Public Speaking এর বিষয়টি রয়েছে– সেখানেই এই বেসিক বিষয়গুলো জানা খুব বেশি দরকারি হয়ে পড়েঃ

১. সবসময় গল্প দিয়ে শুরু করঃ

ছোটবেলায় তোমরা সবাই একটা বিষয় নিশ্চয়ই খেয়াল করে থাকবে। ধরো স্কুলের টিচার খুব আগ্রহ করে অনেক বড় কোনো টপিক পড়াচ্ছেন। বিষয় নিয়ে তার আগ্রহের শেষ নেই, কিন্তু পড়াচ্ছেন একঘেয়ে ভাবে, তার পড়ানোতে তোমাদের কোনো আগ্রহ আসছে না। কিছুদিন পর তুমি খেয়াল করলে যে ওই টপিকের কিছুই আর তোমার মনে নেই!
কারণটা কি জানো?

কারণটা হলো তুমি তার পড়ানোয় মোটেও আগ্রহ পাওনি, তাই সে টপিকটা সেই ক্লাসের পরেই ভুলে গিয়েছো। মজার ব্যাপারটা হলো, এই একই টপিক যদি তোমার টিচার একটু মজা করে, একটু গল্প বলে পড়াতেন, তাহলে গল্পের সাথে সাথে কিন্তু তোমার টপিকটাও মনে থাকবে, কোনোক্রমে ভুলে গেলেও গল্পটা তোমার মনে থাকবেই!

তুমি যখন কোনো প্রতিযোগিতায় প্রেজেন্টেশন দিতে যাও, অথবা কথা বলতে শুরু কর, এখানে মনে করবে এই টিপসটির কথা। মনে রাখবে, তোমার সেই টিচারের মতো করে উপস্থাপন করতে দিতে গেলে সেখানে উপস্থিত বিচারকের অবস্থাও হবে সেই তোমার মতো, তারা দ্রুতই আগ্রহ হারাবেন। কিন্তু এর জায়গায় যদি একটু কায়দা করে তুমি গল্প দিয়ে শুরু কর, তাহলে বিচারকদের আগ্রহ পাবে তুমি, আর তাতেই প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকগুণে বেড়ে যাবে!

২. ভুল থেকেই শিক্ষা নাওঃ

তুমি প্রথম কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছ। প্রথমবারেই একেবারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বসবে, সে সম্ভাবনা খুব বেশি নেই। প্রথমবার নয় শুধু, শুরু র দিকে বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হওয়াটাই তাই স্বাভাবিক। অনেককেই দেখেছি এই প্রথম দিককার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে।
তোমরা মোটেও সেটি করবে না। ইংরেজিতে একটি কথা আছে–

"Every master was once a terrible disaster."

অর্থাৎ যে কেউ তার কাজে পারদর্শী হয়ে থাকলেও, শুরু র দিকে তাদের প্রায় সবাই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছেন। বিখ্যাত লেখিকা জে কে রাউলিং এর বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা হ্যারি পটার সিরিজ প্রথমে কোনো প্রকাশকই নিতে চাননি। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু চেষ্টা থামাননি। একটা সময় যখন হ্যারি পটার প্রকাশিত হলো, বাকিটা ইতিহাস। এখন তিনি বিশ্বের সফলতম লেখকদের একজন।

সফল ব্যক্তিরা সারাজীবনই সফল ছিলেন না। ব্যর্থতার নাগপাশে বদ্ধ থাকতে হয়েছে তাদের অনেককেই। কিন্তু তারা বিজয়ী, কারণ ব্যর্থতাকে

জয় করে সাফল্যের পথ চিনে নিয়েছেন তারা। তুমিও তাই প্রথম দিককার ভুলগুলো নিয়ে হতাশ না হয়ে ভুল থেকে শিক্ষা নাও। সাফল্য আসবেই!

৩. আত্মবিশ্বাসী হও:

তোমার মেধার কমতি নেই। তোমার মাথায় আইডিয়া গিজগিজ করে। তুমি খুব করে চাও কোনো একটা প্রতিযোগিতায় জিততে। কিন্তু কোনো একটা কারণে হচ্ছে না। কথা বলার ওই মঞ্চে যাও তুমি অনেক আশা আর উত্তেজনা নিয়ে, কিন্তু কথা বলতে গেলেই সমস্যা।

এমন যদি হয় তোমার অবস্থা, তাহলে তুমি আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগছ। যেকোনো প্রতিযোগিতায় জিততে হলে এই আত্মবিশ্বাসের খুব বেশি প্রয়োজন। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি সবই থাকতে পারে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস না থাকলে এসব প্রতিযোগিতায় সাফল্যের দেখা খুব একটা পাবে না তুমি।

ধরো, তুমি একটা প্রতিযোগিতায় গেলে। একটা বিজনেস কম্পিটিশন। সেখানে তুমি অনেক তথ্য, অনেক কৌশল নিয়ে গেলে। কিন্তু আসল কথা বলার সময়, উপস্থাপন করার সময় আর ভালোভাবে বলতে পারলে না। কথা জড়িয়ে গেল। আটকে গেল তোমার বিজয়ের সম্ভাবনা।

অন্যদিকে, তোমার বন্ধুটির প্রস্তুতি তোমার মতো নয়। কিন্তু সে আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে বলিয়ান। তার উপস্থাপনায় হয়তো তোমার মতো তথ্যের ভার নেই, কিন্তু আত্মবিশ্বাস আছে। তোমার বন্ধুটিরই কিন্তু বিজয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি হবে!

তাই আত্মবিশ্বাসী হতেই হবে। একবার ভাবো তো, তোমার অমিত প্রতিভা, মেধা আর প্রস্তুতির সাথে যদি যুক্ত হয় আত্মবিশ্বাস– অসাধারণ কিছু করে ফেলতে পারবে তুমি! তাই আজ থেকেই প্রস্তুত হও আত্মবিশ্বাসী হতে, সারা জীবন সেটি তোমার কাজে দেবে!

আশা করা যায় এই তিনটি টিপস মাথায় রাখলে পরের যেকোনো প্রতিযোগিতায় তোমাকে আমরা দেখতে পাব বিজয়ী হিসেবে। বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরে তুমি বলবে, পরিশ্রম আর কৌশলই আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে!

আইডিয়াকে কাজে লাগাও, সাফল্যের পথে পা বাড়াও

আমাকে প্রায়ই অনেকে এসে জিজ্ঞেস করে, "ভাইয়া আমার মাথায় দারুণ একটা আইডিয়া আছে, কী করব এই আইডিয়া দিয়ে? এগুলোকে বাস্তবায়ন করব কীভাবে?" আমি তখন চুপচাপ ওদের আইডিয়াটা শুনি। অবাক হয়ে আবিষ্কার করি, ছোট ছোট ছেলেগুলো অসাধারণ সব আইডিয়া নিয়ে ভাবে, এসব আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু হলে পুরো দেশের আদলই পালটে যেত!

সমস্যা হলো, এই আইডিয়াগুলো বেশির ভাগ সময়েই আইডিয়াই থেকে যায়। এগুলোর আর বাস্তবে রুপান্তর করা হয়ে ওঠে না। ব্যস্ততা, অপর্যাপ্ত ফান্ড এবং উদ্যোগের অভাব– সবমিলিয়ে আইডিয়াটা ভুলেই যায় সবাই। আর এই অসাধারণ আইডিয়াগুলো যাতে হারিয়ে না যায়, তার জন্যে একটা সূত্র আছে। সূত্রটা খুব সাধারণ।

Idea X Effort = Result

বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলা যাক। একটা গল্প বলা যাক। একজন মানুষ, ধরা যাক তার নাম সাদমান। সাদমান অস্বাভাবিক মেধাবী একটা ছেলে, সারাদিন তার মাথায় আইডিয়া গিজগিজ করে। খুব সম্প্রতি তাঁর মাথায় দারুণ একটা ক্যাম্পেইনের আইডিয়া এসেছে, যেটা করলে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা সমস্যার একটা দারুণ সমাধান হবে!

তো সে ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে পদে পদে সমস্যায় পড়তে থাকল। প্রথমেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বলল এই ক্যাম্পেইন করার মত যথেষ্ট জায়গা নেই শহরে। সে লোকবল পেল না, প্রয়োজনীয় টাকাও যোগাড় করা গেল না। একটা সময় সাদমান মহা হতাশ হয়ে পড়ল, তার দারুণ আইডিয়াটি কি তাহলে জলে গেল?

এই গল্পের দুই রকম শেষ আছে। একটা হলো সাদমানের ব্যর্থতার। এত শত বাধা পেরিয়ে সাদমানের আইডিয়া নিয়ে কাজ করার আগ্রহটা চলে যায়

একটা সময়। সে ওসব বাদ দিয়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করে। হারিয়ে যায় আইডিয়া, হারিয়ে যায় সেটি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা।

আরেকটা হলো সাদমানের সাফল্যের। এই ভার্সনে সাদমান হার মানেনি। সে লড়াই করে গেছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাদমান চেষ্টা করে গেছে তার আইডিয়ার বাস্তবায়নের। অবশেষে, একটা সময় তার ক্যাম্পেইন সফল হয়, সে তার আইডিয়া নিয়ে কাজ করে যায়, ঢাকার জলাবদ্ধতা ধীরে ধীরে কমে আসে।

এই গল্পটার সাথে আজকের লেখার সূত্রটার বড় একটা মিল রয়েছে। গল্পে সূত্রটার এপিঠ-ওপিঠ দুটোই দেখা গেছে। একটা মজার ব্যাপার হলো, ছোটবেলায় শেখা সেই সূত্র, যে 0 এর সাথে কোনোকিছুর গুণ করলে ফলাফল শূন্য হয়– এটাই এখানে কাজে লেগেছে।

খেয়াল করে দেখ, গল্পের শেষটার প্রথম ভার্সন, যেখানে সাদমানের আইডিয়াটি হারিয়ে যায়– সেখানে সাদমানের Effort এর জায়গাটায় 0 বসেছে। আর ওই 0 এর সাথে আইডিয়ার গুণফল কিন্তু শূন্যই হয়েছে! সে এখানে Effort দেয়নি, শুধুমাত্র আইডিয়া নিয়েই কাজ করে গেছে। ফলাফল হিসেবে শূন্যের বেশি কিছুই আসেনি!

গল্পের শেষটার দ্বিতীয় ভার্সনে আবার দেখা গেছে সূত্রটার সত্যিকার ব্যবহার। এই ভার্সনে সাদমান হাল ছেড়ে দেয়নি। সে তার মতো করে Effort দিয়েই গেছে, আর তার ফলাফল হিসেবে Result ও এসেছে, সাদমান পেয়েছে সাফল্যের দেখা!

সূত্রটাকে এভাবে দেখা যায়, যে তোমার যত ভালো আইডিয়াই থাকুক না কেন, আইডিয়াকে কাজে না লাগালে, আইডিয়ার পেছনে খাটাখাটুনি না করলে কোনোভাবেই তুমি এগোতে পারবে না। তাই সময় থাকতেই আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু করে দাও। হাল ছাড়বে না, শত বাধা পেরিয়ে তুমিই পারবে বিজয়ী হতে!

মার্শমেলো টেষ্ট ও দুরদর্শীতা

ষাটের দশকে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক খুব মজার একটা পরীক্ষা করেন। তিনি চার বছর বয়সের কয়েকজন শিশুকে একটা রুমের মধ্যে রাখেন। শিশুদের সবার সামনে একটা করে মার্শমেলো, যেটা একজাতীয় মিষ্টি খাবার, রাখা হয়। সবাইকে এবার একটা শর্ত দেয়া হয়। শর্তটা হলো, যে পনেরো মিনিট পরে ওই শিক্ষক রুমে আসবেন, এবং কেউ যদি ওই পনেরো মিনিটে তার মার্শমেলোটা না খেয়ে থাকে, তাহলে আরেকটা মার্শমেলো পাবে সে।

লোভনীয় প্রস্তাব, কিন্তু চার বছরের শিশুরা সে প্রস্তাবের কতটুকুই বা বুঝবে? যাহোক, ক্যামেরায় পুরো এক্সপেরিমেন্টটা ধারণ করা হয়। পনেরো মিনিট পরে শিক্ষক রুমে প্রবেশ করেন, এবং দেখেন যে বেশিরভাগ সময়েই গড়ে প্রতি তিনজন শিশুর একজন তার মার্শমেলোটা রেখে দিয়েছে, যাতে সে পরে আরেকটা মার্শমেলো খেতে পারে!

পরীক্ষার পরের ধাপে এই শিশুগুলো একটু বড় হলে, একাডেমিক পড়ালেখা শুরু করলো। স্ট্যানফোর্ডের সেই শিক্ষক শিশুদের বেড়ে ওঠার দিকে নিবিড় লক্ষ্য রাখেন, দেখেন কে কোনদিকে ভালো করছে। শিশুরা বড় হয়, কলেজে ভর্তি হয়। এসময়ে ওই শিক্ষক একটা বিষয় খেয়াল করেন। সেই যে, তিন জনে একজন মার্শমেলো না খেয়ে জমিয়ে রেখেছিল। সেই ছেলেগুলো তিনটি ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে:

১. SAT Score:

SAT হচ্ছে আমাদের দেশের ভর্তি পরীক্ষাগুলোর মতো। বাইরের দেশে এই স্কোরের উপর ভিত্তি করেই বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ভর্তি নেয়া হয়। দেখা যায় যে, এই এক্সপেরিমেন্টের বাচ্চাগুলোর মধ্যে মার্শমেলো জমিয়ে রাখা বাচ্চারা SAT এ অন্যদের থেকে অনেক ভালো নম্বর পেয়েছে!

২. Low Drop Out Rate:

আরেকটা বিষয় খেয়াল করা যায় ওই শিশুগুলোর মধ্যে। যারা তখনই মার্শমেলোটি খেয়ে নিয়েছিল, তাদের মধ্যে ড্রপ আউট বা কলেজ থেকে বের হয়ে যাবার প্রবণতা বেশি ছিল। অন্যদিকে, যারা জমিয়েছিল, তাদের এই ড্রপ আউটের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য! নেই বললেই চলে।

৩. BMI Rating:

BMI বা Body Mass Index রেটিং থেকে বোঝা যায় একজন মানুষ কতটুকু সুস্থ, সে শারীরিকভাবে কতটুকু ফিট, ফ্যাটের পরিমাণ কেমন আছে এসব। এই রেটিংয়ে ভালো থাকাটা সুস্থ ও সুন্দর থাকার জন্যে অনেক বেশি দরকার। আর ওই মার্শমেলো জমানো ছেলেগুলো রেটিংয়ের দিক দিয়ে একেবারে উপরের দিকে ছিল!

এই পরীক্ষার একটা ফল দেখা যায়। সেটা হলো যে, শর্ট টার্ম গ্র্যাটিফিকেশন বা সাময়িক মোহকে পাত্তা না দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী কোনো সিদ্ধান্ত যারা নেয়, জীবনে তাঁদের সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই টেস্টের যে ছেলেগুলো মার্শমেলো পনেরো মিনিটের জন্যে জমিয়ে রেখেছে, বড় হয়ে তারাই অন্যদের থেকে এগিয়ে গেছে। এই একটা দক্ষতা আছে বলেই তারা এটা পেরেছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এটাই অহরহ ঘটতে থাকে। সাময়িক মোহের পেছনে ছুটতে থাকি আমরা, কখনো তার দেখা পাই আমরা, কখনো পাই না। কিন্তু এই ছোটাছুটিতে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনাগুলো আর কাজে লাগানো হয় না আমাদের। এক পর্যায়ে সাময়িক মোহের চক্রেই আটকা পড়ে যেতে হয়।

আজ ঘুমাতে যাবে বলে যে পড়ালেখাটা কম করলে, সেটা গিয়ে তোমার পরীক্ষায় বাজে ফল আনতে পারে। কিংবা বন্ধুদের সাথে ডিল করবে ভেবে যে প্রজেক্টের কাজটা বাদ দিলে, সেই কাজটাই তোমার জন্যে এনে দিতে পারে বিশাল সাফল্য?

তাই চেষ্টা কর দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা করতে। সাময়িক এসব মোহ, আনন্দ বারবার আসবে। এগুলো হারিয়ে যাবে না। কিন্তু এদের পেছনে ছুটলে দীর্ঘ মেয়াদে গিয়ে ভুগতে তোমাকে হবেই! তাই এই সাময়িক মোহ বা Instant Gratification কে ত্যাগ করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করলেই দেখবে সাফল্য আসবে। এখন তো জেনে নিলে, এই প্রক্রিয়াটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত!

নিজেকে জানো

আমি একটা সময় নিয়মিত ব্যাচে পড়াতাম। তো সব ব্যাচের প্রথম ক্লাসে আমার কমন প্রশ্ন ছিল, তুমি নিজেকে কতটুকু জানো?
প্রায় সবাই হাত তুলে বলত, তারা নিজেকে পুরোপুরি জানে।
তারপর তাদের বলা হতো, আচ্ছা, তাহলে বলো দেখি, তিনটা শব্দ, যা তোমাকে বর্ণনা করবে?

তখন দেখা যায় বেশিরভাগই একটা শব্দও বলতে পারছে না। যারা দু'একটা বলেছে, তারাও নিজেদের শব্দগুলো নিয়ে নিজেই নিশ্চিত না!
মুচকি হেসে তখন বলতেই হয়, নিজেকে তাহলে আর কতটা চিনলে? ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, নিজেকে নিয়ে কিছু বলতে, তাহলে কি আজকের মত আটকে যাবে? অথবা কোনো চায়ের কাপের আসরে যদি বলা হয়, তোমার পরিচিতি দাও- কী জবাব দেবে?

আমি যদি নিজেকে একই প্রশ্ন করি, উত্তর আসে- Teacher, Dreamer, Friend. তাই আমার নিজেকে নিয়ে আমি অন্তত এই ব্যাপারটায় ভীষণ পরিষ্কার। এখন প্রশ্ন হলো, তোমরা কীভাবে নিজেদের জানতে পারবে? সমাধান সহজ। ছোট্ট কিন্তু দরকারি বেশ কিছু কাজ করলেই আরামে নিজেকে জানতে পারবে তোমরাও। কাজগুলো এবার দেখে আসা যাক-

১. নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা রাখো:

তোমার ব্যক্তিত্বই মানুষের কাছে তোমার আসল পরিচয়। তুমি ছেঁড়া জিন্স পর বা স্যুট পর, তোমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে তোমার ব্যক্তিত্ব। তাই নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা রেখো। ব্যক্তি হিসেবে তুমি কেমন, সেটা তোমার থেকে ভালো কেউ জানবে না, তাই নিজের খবর নিজেকেই রাখতে হবে।

২. নিজেকে প্রকাশ কর তিন শব্দে:

চেষ্টা কর নিজেকে তিনটি শব্দে প্রকাশ করার। যদি তাও না পার, তাহলে দুটি শব্দ। না পারলে একটি। ধীরে ধীরে দেখবে তুমি নিজেকে দেখতে

পাবে তিনটি শব্দের মধ্যে। এরপর অপেক্ষা। প্রতিদিন তিনটি করে শব্দ লিখবে, দেখবে সেগুলোর কোনো পরিবর্তন আসছে কি না। পরিবর্তন আসলে সেই পরিবর্তনের মাঝেই নিজেকে জানবে তুমি।

৩. নিজের দোষ গুণগুলো খুঁজে নাওঃ

Self-assesment বা নিজেই নিজেকে যাচাই করা খুবই দরকারি একটি পদক্ষেপ, যদি তুমি নিজেকে জানতে চাও। নিজের ভালো দিকগুলো, ভালো গুণ বা চরিত্রগুলো খুঁজে নাও। তারপর খারাপ দিকগুলোকেও আরেক পাশে রাখো। চিন্তা করতে থাকো, কী করে এই খারাপ দিকগুলোকে ভালোর দিকে আনা যায়। এভাবেই নিজেকে চিনবে তুমি।

৪. জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করোঃ

তোমার জীবনের লক্ষ্য কী? সে প্রশ্নের উত্তরও যদি তোমার না জানা থাকে, তাহলে তুমি আসলেই নিজেকে ঠিকমত চেনো না। একজন মানুষ তার নিজের আত্মাকে চিনবে তখনই, যখন তার লক্ষ্য থাকবে নিশ্চিত, আর সে সেই লক্ষ্যে থাকবে স্থির, অবিচল। তাই নিজের লক্ষ্য ঠিক কর। যদি ডাক্তার হতে চাও, সে পথে এগোও। শিক্ষক হতে চাইলে শিক্ষকতার রাস্তায় এগিয়ে চলো। তবেই না নিজেকে জানবে!

৫. নিজের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো ভালোভাবে জানোঃ

তোমার কী কী ভালো লাগে, কী খেতে ভালো লাগে, কী করতে ভালো লাগে, সে সম্পর্কে তোমার পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। ছোটবেলায় মা যেমন সব খাবার ভাতের সাথে মাখিয়ে খাওয়াতো, বুঝতেও না কী খাচ্ছো- বড়বেলায় এমনটা করলে হবে না। তোমার কিসে ভালো লাগে, কিসে খারাপ লাগে সেটি পরিষ্কারভাবে জেনে নাও, নিজেকে আবিষ্কার কর। তাহলেই চিনবে নিজেকে।

সক্রেটিসের সেই 'Know Thyself' উক্তিটির মতোই নিজেকে খুঁজে ফিরছে হাজারো মানুষ। তুমি কি তাদেরই একজন হবে, নাকি সাফল্যের বিজয় মঞ্চে উঠে আসবে নিজেকে সত্যি জেনে?
সিদ্ধান্ত কিন্তু তোমারই!

কিন্তু সিজিপিএ?

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কাউকে ইদানীং তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন নিয়ে জিজ্ঞেস করলে দুই ধরনের উত্তর পাওয়া যায়। এক দল আছে যারা মহানন্দে নতুন এই জীবন উপভোগ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটির পাশাপাশি পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনটা বেশ উপভোগ্যই বলতে গেলে।

আরেক দল হচ্ছে সিজিপিএ পাবলিক। এদের দিন দুনিয়ার সবকিছু ঘিরে শুধুই সিজিপিএ। ডিবেট করতে যাবার কথা বললে তারা সিজিপিএর দোহাই দেয়। গান গাইতে বললে সিজিপিএ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেতে বললে সিজিপিএ; কোনো ক্লাবে যোগ দেবার কথাতেও তাদের ওই একটাই উত্তর কিন্তু আমার সিজিপিএর কী হবে? অবস্থা এমন যে এদের আবেগও হয়ে গিয়েছে সিজিপিএ নির্ভর। প্রেম তাদের শুধু সিজিপিএর সাথেই! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে, এই দলের বেশিরভাগকেই যদি তাদের সিজিপিএ জিজ্ঞেস করা হয় মুখটা কেমন কালো হয়ে যায়। মৃদু স্বরে উত্তর আসে, ২.৯০!

আমরা আজকে প্রথম দলটা নিয়েই কথা বলব। যারা শুধু সিজিপিএ না, বরং চারপাশের দুনিয়াটারও একটা জীবন্ত অংশ হতে চায়। তাদের অনেকেরই প্রশ্ন, দ্বিতীয় দল এভাবে পাগলের মতো সিজিপিএর পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে কেন? খুব ভালো সিজিপিএ ছাড়া কি জীবনে সাফল্য পাওয়া যাবে না?

নিয়ন্ত্রণে রাখো নিজের সুখ

আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছুই ঘটে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার কোনো সুযোগই নেই। সমস্যা হলো যে, এটি নিয়ন্ত্রণ করার কোনো সুযোগ নেই জেনেও আমরা ওই ঘটনাগুলো নিয়েই সারাদিন পড়ে থাকি, আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয় সেগুলো। আর তাই জীবন সবসময় সুখী হয় না, সুখে থাকতে পারিনা আমরা। এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেজন্যে চমৎকার একটা সূত্র আছে।

সূত্রটার নাম **'90/10 Principle'**। **Stephen Covey** নামের এক ভদ্রলোকের আবিষ্কার। তিনি এখানে দেখিয়েছেন কীভাবে জীবনের ছোটখাটো নিয়ন্ত্রণহীন খারাপ ঘটনাগুলোকে ইতিবাচকশক্তি বা Positive energy দিয়ে বশে আনা যায়। তিনি পুরো ধারণাটা একটা গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গল্পটা বলা যাক।

একটা ছোট পরিবার। বাবা, মা এবং ছোট্ট একটি মেয়ে। তারা একদিন সকাল বেলা নাস্তা করছে। ছোট মেয়েটা হঠাৎ ভুল করে চায়ের কাপ ফেলে দেয় বাবার ইস্ত্রি করা শার্টের উপর। বাবা তো রেগে আগুন! মেয়েকে প্রচন্ড একটা ধমক দিলেন, স্ত্রীকে বকাবকি করলেন, কেন সে চায়ের কাপ টেবিলের কিনারে রাখল? বকা খেয়ে আহ্লাদি মেয়েটি জোরে কেঁদে উঠল।

কিছুক্ষণ পর শার্ট পাল্টিয়ে এসে বাবা দেখেন তার মেয়ে তখনও কান্না করছে, খাবার এখনো শেষ করেনি। তিনি আরো ধমকালেন মেয়েকে। মেয়ে আরো বেশি কান্না করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে মেয়ের স্কুলের বাসটাও চলে গেল। এখন বাবাকেই স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে। এসব ভেবে বাবার মনে আরো রাগ জমে উঠল।

মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেবার পথে স্বাভাবিকের চাইতে জোরে গাড়ি চালাতে গিয়ে জরিমানা গুণতে হলো। যে মেয়ে প্রতিদিন বাবাকে বাই না বলে স্কুলে ঢোকে না, সেই মেয়ে আজ বাবাকে বিদায় না জানিয়ে এক দৌড়ে চলে গেল স্কুলে।

তিনি অফিসে পৌঁছালেন ১৫ মিনিট দেরি করে। খেয়াল করে দেখলেন তাড়াহুড়োয় অফিসের ব্রিফকেস আনতে ভুলে গেছেন। এখন আরো বিপদ, অফিসের বস তার উপর চড়া। দিন তীব্র খারাপের দিকে যেতে লাগল। অফিসের কাজও ঠিকমত হলো না। রাত্রে অফিস শেষে বাসায় এসে দেখলেন মেয়ে ঘুমিয়ে গেছে।

অথচ অন্যদিন বাবা আসলেই সবার আগে মেয়ে দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে, জিজ্ঞেস করে "বাবা, আমার জন্যে কী এনেছ?" আজ সে আসলো না। তার স্ত্রীও আজ অনেকটাই নীরব। তিনি একা একা খাওয়া-দাওয়া করলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। দিনটা তো খারাপ গেলই, এখন রাতটাও। এভাবে পরিবারের মাঝে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হলো।

অথচ গল্পটা যদি এমন হতো,
ছোট্ট মেয়েটা ভুল করে চায়ের কাপ ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই ভয় আর অনুশোচনায় সে কান্না করতে শুরু করলেই বাবা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন- "থাক, সমস্যা নেই। আমিও অনেকবার আমার বাবার গায়ে চা ফেলেছি। তবে হ্যাঁ, এখন থেকে সাবধান, ঠিক আছে?"

মেয়েটা একটু হেসে বলল- "আচ্ছা বাবা, আর হবে না"। মেয়ে তখন স্কুলে গেল। বাবা সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে সুন্দর করে ৫ মিনিট আগেই অফিসে পৌঁছালেন। অফিসের বস তার কাজের প্রশংসা করলেন। সারাদিন অফিসে কাজ করে রাতে বাসায় আসতেই মেয়েটা দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল, বাবার আনা চকলেটগুলো একটা একটা করে খেতে লাগল। পুরো পরিবার হাসি আর আনন্দের সাথে ডিনার করল। একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার দেখা গেল।

দিনটা অনেক সুন্দর গেল, তাই না? প্রথম গল্প আর শেষ গল্পের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রথম গল্পে বাবার মেজাজের কারণে পুরো দিনটাই খারাপ গেল পরিবারের সবার জন্য। আর পরের গল্পটা খুব সহজেই সুন্দর সমাপ্তিতে পৌছালো শুধুমাত্র বাবা তার মেজাজ ঠিক রেখেছেন বলে।
স্টিফেন কভে বলেন, প্রথম ঘটনাটি পুরোটাই বাবার দোষ। কারণ, চায়ের কাপ পড়ে যাবার মতো আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে

১০% এমন ঘটনা থাকে যেগুলোর উপরে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু ওই ১০% অনিচ্ছাকৃত ঘটনার উপর আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেটার উপর নির্ভর করে বাকি ৯০% ঘটনা ঠিকভাবে যাওয়া না যাওয়া।

প্রথম গল্পে বাবা ১০% সেই ঘটনাটি নিয়েই ভেবেছেন, নেতিবাচকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। ফলাফল? একটি বাজে দিন। দ্বিতীয় গল্পে বাবা সেই ১০% ঘটনাটিকেই অনিয়ন্ত্রিত ভেবে ধরে নিয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। ফলাফল? একটি ভালো দিনের সমাপ্তি।

আমাদের জীবনে অনেক সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যেগুলোতে আমাদের কোনো হাত না থাকলেও তাতে অনেক সমস্যা হয়। ধরো, স্যুটেড বুটেড হয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে যাচ্ছ, হঠাৎ উপর থেকে একটা কাক তোমার কালো স্যুটে প্রাকৃতিক কর্ম সেরে দিল। এখন তুমি তো আর কাককে আক্রমণ করতে পারবে না, বিষয়টি মেনে নিয়ে তোমাকে স্যুট পরিষ্কার করার উপায় খুঁজতে হবে। তাহলেই দিনটা খারাপ না হয়ে ভালোর দিকে যাবে।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। আসল কথা হলো, তোমার সুখ, তোমার সাফল্য সবই নিজের কাছে। তুমি চাইলেই পার এসব বদলাতে। তোমার ইচ্ছাশক্তিই আসলে নিয়ন্ত্রণ করবে তোমার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

হয়ে ওঠো পাওয়ার পয়েন্টের জাদুকর

পাওয়ার পয়েন্ট নামটি শুনলেই চোখের সামনে ভাসে সেই অতি পরিচিত সফটওয়্যারটি, প্রেজেন্টেশন বানানোর ক্ষেত্রে যার বিকল্প নেই বললেই চলে। দারুণ দরকারি এই সফটওয়্যারটির কাজের ক্ষেত্র কিন্তু শুধুমাত্র প্রেজেন্টেশনেই সীমাবদ্ধ নেই! বরং বলতে গেলে প্রেজেন্টেশনের স্লাইড বানানো পাওয়ার পয়েন্টের অনেকগুলো কাজের একটা মাত্র। মজাদার এই পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে দারুণ সব কাজ করে ফেলা যায়, যেগুলো তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে তোমাকে অনেকটা এগিয়ে রাখবে অন্যদের থেকে। তাহলে চলো দেখে আসা যাক পাওয়ার পয়েন্টের জাদু!

১. খুব সহজে ভিডিও বানানো:

পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে যে ভিডিও বানানো যায়, ব্যাপারটা শুনে অবাক হলে বুঝি? আসলেই পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে দারুণ সব ভিডিও তৈরি করা সম্ভব। দরকার শুধু সঠিক ব্যবহারটা জানা।

আমরা অনেকেই কিন্তু দেখেছি পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে এনিমেশন করা। একটা লেখা বা ছবি অন্য দিকে চলে যায়, উড়তে থাকে– এমন কত কী। এগুলোকে যদি সেভ করার সময় mp4 এ কনভার্ট করা যায়, তাহলেই দারুণ মজাদার এবং কাজের সব ভিডিও বানানো খুবই সম্ভব!

২. ইলাস্ট্রেটরের বিকল্প:

ইলাস্ট্রেটরে কাজ করতে গিয়ে অনেকেরই অনেক রকম সমস্যা হয়, যার মূল কারণ হলো এর কাজ বোঝা একটু জটিল। পাওয়ার পয়েন্টে এসব জটিলতার বালাই নেই, তাই প্রথমবার ডিজাইন করতে এসে যে কেউ মহানন্দে চমৎকার সব ডিজাইন করে ফেলতে পারে!

৩. নিজেই তৈরি কর ইনফোগ্রাফিক:

ইনফরমেশন আর গ্রাফিক, দুয়ে মিলে ইনফোগ্রাফিক। জটিল সব তথ্য গ্রাফিকে দেখিয়ে সহজে বুঝিয়ে দেবার অস্ত্র হলো ইনফোগ্রাফিক। দারুণ এই জিনিসটি তৈরি করা কিন্তু খুব কঠিন কিছু নয়!

তোমার পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডটিকে একটু লম্বা করে নাও, তারপর তোমার ছবি আর ইনফরমেশনগুলো সেখানে বসিয়ে ডিজাইন করে ফেলো। তারপর pdf বা ছবি আকারে এক্সপোর্ট করে ফেলো। তাহলেই হয়ে গেল তোমার ইনফোগ্রাফিক!

৪. আর নয় কভার ডিজাইন নিয়ে ঝামেলাঃ

আমরা অনেক সময় অনেক কাজেই কভার ডিজাইন নিয়ে ঝামেলায় পড়ি। ধরো তুমি তোমার ব্যাচ থেকে কোনো ম্যাগাজিন বের করতে চাচ্ছ, সেটির জন্যে কভার ডিজাইন লাগবে। আবার যেকোনো টার্ম পেপার বা এসাইনমেন্টের কভার ডিজাইন করতেও প্রায়ই ঘাম ছুটে যায় সবার।

অথচ পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করলে এই কাজটিই হয়ে যায় মহা সহজ! পাওয়ার পয়েন্টে সব ধরনের টুলস দেয়াই আছে, দরকার শুধু তোমার সদিচ্ছা আর সৃজনশীলতা।

৫. নিজের সিভি নিজেই ডিজাইন করঃ

বিভিন্ন জব সেক্টরে চাকরির জন্যে দরকার হয় একটি সিভি। তোমার সিভিই চাকরির বাজারে তোমার পরিচয়, আর তাই সেটিকে হতে হয় চমৎকার। পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে এই মানসম্মত সিভি তৈরি করা সহজ হয়ে যায় অনেকটাই!

কিংবা ধরো কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে পরিচিত হতে চাও তুমি। পাওয়ার পয়েন্টে ডিজাইন করা নিজের একটা বিজনেস কার্ড থাকলে ঝট পট তাকে দিয়ে ফেলে স্মার্টলি পরিচিত হতে পার তুমি! দরকার শুধু বিভিন্ন সাইজে ডিজাইন করা তোমার সিভি।

৬. এনিমেশন তৈরি এখন হাতের নাগালেঃ

টিভি বা কম্পিউটারের পর্দায় এনিমেটেড কার্টুন দেখে বিমলানন্দ পাই আমরা সবাই। কিন্তু যদি বলি, এ ধরনের এনিমেশন তুমি ঘরে বসেই করতে পারবে? অবিশ্বাস্য লাগছে না শুনতে?

অবিশ্বাস্য হলেও এটি সত্যি। পাওয়ার পয়েন্টের জাদুর ছোঁয়ায় তুমিও পারবে নানা রকম এনিমেশন করে নিজের স্কিল বাড়াতে। সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে করতে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পার এনিমেশনেও।

আমাদের অধিকাংশই বই বলতে মূলত দুরকমের বইকে বুঝি! একটা পাঠ্যবই অন্যটা গল্পের বই ।

হাজারো ফিকশনের ভীড়ে আমরা আজকাল অন্য কোনও বিষয় নিয়েও যে লেখা যেতে পারে তা ভুলতেই বসেছি!

বই পড়ে আমরা আমাদের কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারি । কেমন হতো যদি বই পড়ে বদলে ফেলা যেত নিজেকে? শেখা যেতো হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার, অপরিচিত কারও সাথে প্রথমবারের মতো ফোনে কথা বলার কিংবা সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মতো দারুণ এবং বাস্তব জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কৌশল!

'Never Stop Learning' বইটিতে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে তেমনি কিছু আইডিয়া যেগুলো বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের কল্পনা আর সৃজনীশক্তির বিকাশের পাশাপাশি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উন্নয়নেও সহায়তা করবে!

৭. ওয়েবসাইট ডিজাইন কর নিজেইঃ

আমি যদি বলি, তোমরা এখন যে 10 Minute School এর ওয়েবসাইটটি দেখছ, সেটির পুরো ডিজাইন করা হয়েছে পাওয়ার পয়েন্টে!

অস্বাভাবিক শোনালেও এটাই সত্যি, যে পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে ওয়েব সাইটের ডিজাইনগুলোও করা সম্ভব। পাওয়ার পয়েন্টে যেসব টুল রয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে নিজেই করে ফেলতে পার একটি ওয়েব সাইটের ডিজাইন।

৮. ঝামেলাবিহীন লিফলেট ডিজাইনঃ

ধরো, তুমি ছোটখাট একটা ব্যবসা শুরু করেছো। তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এখনো কেউ চেনে না। সবাইকে চেনাতে হলে তাই দরকার ব্যাপক প্রচার। এটির শুরু করতে হবে তোমাকে লিফলেট তৈরি করে। না, অমুক ভাইকে তমুক মার্কায় ভোট দিন; এরকম লিফলেট তৈরি করলে কিন্তু হবে না! পাওয়ার পয়েন্টে একটি স্স্লাইড নিয়ে সেটি A4 সাইজ করে মনমতো ডিজাইন করে ফেলো। তারপর সেটিকে প্রিন্ট কর। বাস, হয়ে গেল তোমার লিফলেট!

৯. ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন করাঃ

তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ ফেসবুকে বড় বড় পেজগুলো বিভিন্ন পোস্ট শেয়ার করে, যেগুলোর কোনোটিতে হয়তো কোনো বিজ্ঞাপন, কোনোটিতে ঘোষণা আবার কোনো কোনোটি তথ্য নিয়ে। এই পোস্টগুলো কিন্তু তুমিও বানিয়ে ফেলতে পার! কিভাবে?

প্রথমে পাওয়ার পয়েন্টে যাও। এরপর তোমার স্লাইডটাকে Square আকারে রাখো। তারপর ওটার উপরে ডিজাইন করেই ছবি আকারে এক্সপোর্ট কর। এবং এরই সাথে সাথে তুমিও বানিয়ে ফেললে চটকদার ফেসবুক পোস্ট!

তাহলে আর দেরি কেন? ঝটপট ঘুরে এসো পাওয়ার পয়েন্টের রাজ্য থেকে আর নিজেকে দক্ষ করে তোলো প্রযুক্তির নতুন এই যুগে।

টলারেন্স নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা

রুটে দুইটা বাস ছিল, একটা হচ্ছে বিআরটিসি আরেকটা হচ্ছে ৪ নাম্বার। সন্ধ্যা বেলায় যখন ক্লাস শেষ হতো বাস গুলায় অনেক ভীড় থাকত। প্রতিদিনই বাস কাউন্টারগুলোয় মজার কিছু ঘটতোই।

মজার বলতে ঝগড়া বাঁধা। দু'টাকা বেশি নেয়া থেকে শুরু করে কে কোথায় বসলো কার কোথায় ধাক্কা লাগলো আর কে বের হতে পারছে না এসব, এ ধরনের ঝগড়া সবসময়ই হতো।

তখন মনে হতো বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে টলারেন্স বা সহ্য ক্ষমতার মাত্রাটা বোধহয় কম। কিছু হলেই আমরা রেগে মেগে আগুন হয়ে যাই। একটুতেই বিরক্ত বা হতাশ হয়ে যাই।

তো আমি একটা ছোট্ট কাজ করতাম। আমার সাথে যদি কারও ধাক্কা লাগতও, সে রক্তচক্ষু করে তাকানোর আগেই আমি তাকে ছোট্ট করে একটা সালাম দিতাম।
বলতাম, "আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, I am really really sorry।"
That's it। সালাম দিলেই অর্ধেক শান্ত হয়ে যায়। আর স্যরি বললে পুরোপুরি ঠাণ্ডা।

আমার মনে হয় যে হ্যাঁ, বাংলাদেশের মানুষের টলারেন্স মাত্রা কম, কিন্তু এই ছোটখাটো প্র্যাকটিস যদি আমার ধরে রাখতে পারি, আশপাশের মানুষের টলারেন্স একটু হলেও বাড়বে, এবং তোমাকে দেখে আরো কয়েকটা মানুষ হয়তো শিখবে এবং জিনিসটা "Ripple Effect" এর মত চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে।

তাই এরপর গায়ে ধাক্কা লাগলে একজন আরেক জনের দিকে রক্তচক্ষু দিয়ে না তাকিয়ে একজন আরেকজনকে স্যরি বলবে। আমার মনে হয় এমন একটা পৃথিবীর আশা আমরা করতেই পারি।

চ্যাটিং করা থেকে যদি দারুণ কিছু হয়, চ্যাটিং করা ভালো!

চৌধুরী অ্যান্ড হোসাইন এর ইংরেজি ব্যাকরণের বই পড়েনি বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে আজকাল এমন 'অমাবস্যার চাঁদ' নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের পাঠ্যক্রমের অত্যাবশ্যকীয় পাঠ্যপুস্তক এটি। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ভর্তিপরীক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন রংয়ের কভারের ভিতরে থাকা একই কথাগুলো আমরা বারবার পড়ে যাই, পরীক্ষা দেই এবং যথাসময়ে ভুলেও যাই।

অবাক করার মতো হলেও এটা কিন্তু সত্যি যে, সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে ইংরেজি পড়ে আসার পরও ইংরেজিটা আমাদের কাছে এখনও একটা আতংক হিসেবেই বিরাজ করে। আমাদের মধ্যে এখনও এমন অনেকে আছে যাদেরকে ইংরেজিতে কোনও কথা বলতে বললে রীতিমতো ভয় পেয়ে, লেজ তুলে উল্টোদিকে দৌড়ে পালাবে।

কিন্তু কেন?

কারণ, ইংরেজি একটা ভাষা। আমরা দীর্ঘ বারো বছর ধরে শুধু এর ব্যাকরণই পড়ে এসেছি। আর কোনো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কথ্যরূপে ব্যাকরণ তেমন একটা ভূমিকা রাখে না। তাই, আমাদের ইংরেজি বলতে গেলে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায়ই বা কি?

ইংরেজি শেখার জন্য আমরা অনেকের কাছ থেকেই ইংরেজি মুভি দেখা, খবরের কাগজ/ ম্যাগাজিন পড়া, বই পড়া কিংবা আয়নার সামনে বা বন্ধুদের সাথে চর্চা করার মতো বিচিত্র সব পরামর্শ নিয়মিত পেয়ে থাকি।

কিন্তু, বই বা খবরের কাগজ পড়া কিংবা মুভি দেখার মতো কাজগুলো ক্ষেত্রবিশেষে করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধুদের সাথে চর্চা করার বিষয়ে আমরা তেমন একটা আগ্রহী নই। কারণ, বন্ধুদের সাথে চর্চা করতে গেলে তিরস্কার আর কটুক্তির আশংকায় আমরা এক পা এগিয়ে আবার দু'পা

পিছিয়ে যাই। অথচ, কোনও ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সে ভাষাতে কথা বলার চর্চা করাটা খুবই জরুরী।

আজ তোমাদেরকে একটা মজার আইডিয়া দিতে চাই যেটা কি না তোমাদের ইংরেজিসহ যে কোনও ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে অনেক সাহায্য করবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অশেষ কৃপায় সামনাসামনি বসে আড্ডা দেওয়ার প্রথা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়! এখন, সাতসমুদ্র–তেরো নদীর ওপারের বন্ধুদের সাথেও ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারের গ্রুপে বসে আরামে আড্ডা দেয়া যায়।

আমরা সবাই কিন্তু রোজই সারাদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা কিংবা নতুন কাজের পরিকল্পনা বা ক্ষেত্রবিশেষে অনেকের সমালোচনার ঝুড়ি নিয়েও গ্রুপে চ্যাট করতে বসে যাই।

আইডিয়াটা খুবই সোজা। নতুন একটা চ্যাটিং গ্রুপ খুলে ফেলো। একই কাজ, একই গ্রুপ তবে এবার শুধু ভাষাটা বদলে গিয়ে ইংরেজি হয়ে যাবে।

আর কয়েকটা শর্ত অনুসরন করোঃ

১. যাই লেখা হোক না কেন সেটা যেন ইংরেজিতে হয়ঃ

চ্যাটিং গ্রুপে নতুন ভ্রমনের পরিকল্পনা বা সারাদিনের বিবরণ কিংবা কারও সমালোচনা যাই লেখা হোক না কেন সম্পূর্ণ ইংরেজিতে লিখতে হবে।

২. বাক্যের শুরুর শব্দ লেখা হোক ক্যাপিটাল বা বড় হাতের আদ্যক্ষরেঃ

আমরা অনেকেই ইনবক্সে ছোট হাতের আদ্যক্ষরে লেখা শব্দ দিয়ে বাক্য লিখি। এ অভ্যাসটা বর্জনীয়।

৩. বানানে সতর্কতা অবলম্বন করাটা জরুরীঃ

লেখার সময় সর্বদা শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে। এতে করে শুদ্ধভাবে লেখার দক্ষতা বাড়বে।

৪. শব্দ সম্পূর্ণ লেখাটা বাধ্যতামূলকঃ

অনেকে চ্যাটিং এ ইংরেজি শব্দ ছোট করে লিখতে লিখতে ওই শব্দের আসল চেহারা আর বানানটাই ভুলে বসে আছে। ফলাফল স্বরূপ, ইংরেজি পরীক্ষার খাতায়ও সংক্ষিপ্ত বানানে ভুল শব্দ লিখে আসে।
যেমনঃ Phone না লিখে phn, Thanks না লিখে tnx, Hello না লিখে hlw, Welcome এর পরিবর্তে wlcm ইত্যাদি।

৫. শব্দের বানানে সংখ্যা নয়ঃ

অনেকে Right, Fight, Night, Sight এ শব্দগুলোকে যথাক্রমে r8, f8, n8, s8 লেখে। এটা বর্জন করতে হবে।

৬. Vowel এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবেঃ

অনেকেই সংক্ষেপে ইংরেজি লিখতে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় কার নামে পরিচিত Vowel শব্দটিকে রীতিমতো অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিয়েছে। Good না লিখে gd, wait না লিখে wt, Thank you এর বদলে Tnq লেখে। এটা বর্জন করতে হবে। প্রতিটা শব্দে a, e, i, o, u বা পাঁচটি vowel এর সঠিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. এক অক্ষরে শব্দের প্রকাশকে না বলতে হবেঃ

ইংরেজি Are, See, You ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ এক একটি ইংরেজি বর্ণের অনুরূপ! অনেকে তাই লিখতে গিয়েও পূর্ণ শব্দের পরিবর্তে r, c, u লিখে ফেলে। এটা পরিবর্তন করতে হবে।

এ শর্তগুলো মেনে মাস খানেক গ্রুপে চ্যাটিং করার পর নিজেই নিজের পরিবর্তনটা দেখতে পাবে।

তাহলে, আর দেরি না করে আজই তোমার সব প্রিয় বন্ধুদেরকে নিয়ে একটি মেসেন্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটিং গ্রুপ খুলে ইংরেজিতে কথোপকথন শুরু করো। শুধু ইংরেজি নয় শুদ্ধ বাংলা বলা ও লেখার দক্ষতা বাড়াতেও এ প্রক্রিয়া অনুসরণ বেশ ফলপ্রসূ!

রাজার অসুখ আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

এক রাজার গল্প বলি। রাজার বিশাল রাজ্য, বিশাল রাজপ্রাসাদ। সেখানে তিনি মহানন্দে খানাপিনা করেন আর সুখে থাকেন। জীবনে সুখের কোন শেষ নেই! এমন একটা অবস্থায় হুট করে রাজার এক অসুখ হলো। এত সুখ মনে হয় তাঁর কপালে সইলো না, তাই এমন এক অদ্ভুত রোগ হলো যে সে রোগের দাওয়াই দিতে পারলো না রাজার যত জ্ঞানীগুণী বৈদ্য, রাজার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যেতে থাকলো।

রাজার রোগটা বড়ই আজব। তিনি চোখে দেখেন না। না, তার মানে এই না যে তিনি অন্ধ। তাঁর সমস্যাটা হলো যে তিনি হুট করেই চোখে ঠিকমতো দেখতে পারছেন না। বিষয়টা এত অদ্ভুত, বলার মতো না। রাজা তাঁর নিয়মমত একদিন ঘুমোতে গেলেন তাঁর চার রাণীকে নিয়ে, ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে তিনি চোখে ঠিকমতো আর দেখতে পারছেন না।

রাজ্যময় হৈচৈ পড়ে গেল, রাজার কী হলো কী হলো রব। হাজারো বৈদ্য বৃথা গেল, অনেকে আবার শূলেও চড়লো দাওয়াই না বের করতে পেরে। অবশেষে রাজা পেলেন এক বৃদ্ধ সাধুর দেখা। এই সাধু নাকি পৃথিবীর যাবতীয় রোগের উপশম করতে পারেন। সব শুনে তো রাজা বড় খুশি, এবার বুঝি তাঁর চোখটা বেঁচেই গেল! তিনি খোঁজ লাগাতে বললেন, যেখান থেকে পারে, সাধুকে যেন প্রাসাদে তুলে নিয়ে আসে!

সাধু এলেন। রাজাকে একনজর দেখলেন। দেখেই বলে বসলেন, "এ রাজার চোখে বিচিত্র এক রোগ আছে। এ রোগের দাওয়াই একটাই!" সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো, বললো, "কি দাওয়াই, সাধুমশাই? বলুন না একটিবার?"

সাধু বলে দিলেন সেই মহৌষধ। আসলে, সেটাকে ওষুধ না বলে বরং বলা উচিত কৌশল। তিনি রাজাকে বললেন বেশি বেশি করে লাল রং দেখতে। রাজা যতো লাল দেখবেন, তার চোখ ততো পরিষ্কার হবে। সে যুগে তো আর ফটোশপের বায়না নেই, প্রযুক্তির ছোঁয়া আসে নি সেখানে।

রাজামশাই ঘোষণা দিলেন, এখন থেকে তাঁর চারপাশের সবকিছু যেন লাল রং করে দেয়া হয়। দেয়াল লাল, প্রাসাদ লাল, রাণীর প্রসাধণী লাল,

বাঈজির নাচের জামা লাল, প্রহরীর শিরস্ত্রাণ লাল- সবকিছু যেন লালে লাল হয়ে গেল! রাজামশাই দিব্যি খুশি। একগাদা লালের মাঝে বসে তিনি আবার আগের মত ঝকঝকে দেখতে পান সবাইকে।

একদিন সাধুর খুব শখ হলো, রাজামশাই কেমন আছেন, সেটা দেখার। তিনি হাজির হলের প্রাসাদে। প্রহরীসহ সবাই তাঁকে চিনে গেছে এতোদিনে, হাজার হোক রাজার অসুখ সারানোর বদ্যি পুরো দেশে আর একজনও তো নেই! প্রহরীরা তাঁকে ভেতরে নিয়ে গেল বটে, তবে আসার আগে তাকে লাল রং দিয়ে গোসলই করে দেয়া হলো! এটা সাধুর ঠিক পছন্দ হলো না।

রাজার মহাসভা। সবাই উপস্থিত। রাজা তো সাধুকে দেখে মহাখুশি, বললেন "আসুন আসুন সাধুবাবা, আপনার দিব্যিতেই আমি চোখ ফিরে পেয়েছি, বলুন আপনি কী চান!"

সাধু কিছুই বললেন না। একটু পর উঠে রাজার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "পুরো দেশটাকে লাল রং করে ফেলার থেকে আপনি নিজেই একটা লাল কাচের চশমা পরে নিলে কি হতো না? নিজের জন্যে পুরো দেশকে লাল করে দেয়ার কী দরকার ছিল, রাজামশাই?"

রাজার কাছে সে প্রশ্নের উত্তর আর ছিল না।

গল্পটা এখানেই শেষ। এই গল্পের একটা মোরাল আছে। মোরালটা হলো, নিজের দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে অন্যকে পাল্টাতে না বলে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটে ফেললেই পৃথিবীটা আরো সুন্দর হয়ে যায়।

গল্পটাকে রূপক ধরা যাক। বাস্তব জীবনে, নিজের সিদ্ধান্ত, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের উপরে চাপানোর দোষে দুষ্ট কিন্তু অনেকেই। এখানে খুব সোজা বাংলায় বলতে গেলে, অন্যের কোনকিছুকে জাজ করা বা সেটা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার থেকে দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টিয়ে ফেললেই অনেক ভালো হয় না?

সম্প্রতি দেখলাম একটা ভিডিও আলোড়নে এসেছে, সেখানে বেশ মোটা দাগে ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, সেটা আবার অনেকে সাপোর্টও করছে! এখানেও সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই সমস্যা। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টে দিতে পারলে দেশ এবং পৃথিবী আরো অনেক বেশি ভালো হয়ে যাবে। নিষ্কলঙ্ক সেই পৃথিবীর প্রত্যাশাই করি আমরা, প্রতিনিয়ত।

আমার প্রথম পাবলিক পরীক্ষা আর ডোপামিন ইফেক্টের গল্প

আমার তখন এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। জীবনের প্রথম বড়সড় পাবলিক পরীক্ষা। মনের মধ্যে স্বভাবতই অনেক টেনশন, কী হবে না হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। পরীক্ষা খারাপ হবে কি না সেটা আবার আরেক টেনশন। মোটামুটি বাজে অবস্থা।

এর উপরে আরো দুই ধরণের মানুষের জ্বালাতনে মরে যাই যাই অবস্থা। যে আত্মীয়দের কস্মিনকালেও আশেপাশে দেখি নি আমিসহ আমাদের বাসার কেউ, সেই মানুষগুলো সমানে ফোন দিয়ে পরীক্ষার খোঁজখবর নিচ্ছে, কথাবার্তা বলছে। চরম বিরক্তিকর বিষয়। তার উপরে আমার কিছু ন্যাকা বন্ধু প্রায়ই ফোন দিয়ে বলছে "দোস্ত আমি কিচ্ছু পারি না, ফেইল করবো, কী যে হবে!" অথচ আমি নিশ্চিত সে এসএসসিতে গোল্ডেন এ প্লাস চোখ বন্ধ করে পেয়ে যাবে। বিশ্রি অবস্থা।

যাহোক, প্রথম পরীক্ষার দিন। আমার সাথে আমার প্রথম পরীক্ষায় এসেছেন আমার মা। তাঁর সাথে আমার কথোপকথন–
মাঃ আয়মান, বাবা পেন্সিল নিয়েছিস?
আমিঃ *ক্ষীণ কণ্ঠে* হ্যাঁ, মা।
মাঃ আয়মান, বাবা ইরেজার নিয়েছিস?
আমিঃ *আরো ক্ষীণ কণ্ঠে* হ্যাঁ, মা।
মাঃ আয়মান, বাবা পেন্সিল শার্প করে নিয়েছিস তো?
আমিঃ *শোনা যায় না এমন গলায়* হ্যাঁ, মা।

এবার মা ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। বলে বসলেন, "বাবা পেন্সিল বেশি শার্প করিসনি তো ?"

আমি মোটামুটি যারপরনাই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। আর কিছুই বললাম না। মা এবার শুরু করলেন তাঁর ভোঁতা পেন্সিলের কারসাজি। তিনি বললেন,

"বাবা ও এম আর শিটের জন্যে তুই ভোঁতা পেন্সিল নিয়ে যা। দ্রুত গোলল্টা ভরাট করতে পারবি"। আমি চিন্তা করে দেখলাম, ভালোই তো আইডিয়া!
যেই বলা সেই কাজ। মা শুরু করে দিলেন তাঁর কাজ। শব এ বরাতে যেমন রুটি আর হালুয়া বানায়, সেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মুহূর্তেই আমার দুটো পেন্সিল ভোঁতা হয়ে গেল।

এখানেই শেষ না গল্পের। পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি, ও এম আর শিটে পেন্সিল দিয়ে ভরাট করা যায় না, শুধুমাত্র বলপয়েন্ট পেন লাগে। মনে হলো, আম্মুর ভোঁতা করা পেন্সিলগুলো যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাহা করে হাসছে, আর বিদ্রুপ করছে আমার মন্দ ভাগ্যকে!

যাহোক, পরেরদিন পরীক্ষা দিতে গিয়েছি। হলের কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম আমার এক পরিচিত বন্ধু ওদের গাড়ি থেকে নামছে। ওদের আবার বিশাল নোয়াহ মাইক্রো, ভাবটাই আলাদা! আমি ওকে দেখেই স্বভাবস্বরুপ চিৎকার করে ডাক দিয়ে একটা দৌড় দিলাম। মাঝপথে গিয়ে খেয়াল করলাম, বন্ধুর মুখ থমথমে। বুঝলাম কোন একটা সমস্যা হয়েছে। ওদিকে আর না গিয়ে দেখতে থাকলাম কী হয়। যা দেখলাম সেটা অতীব আশ্চর্য।

মাইক্রো থেকে এক এক করে ছেলেটার মা, বাবা, নানা, নানী, দাদী, চাচা এবং সম্পূর্ণ অচেনা একটা মানুষ নামলেন। আর কিছু সময় পরে দেখলাম সদ্যজাত একটা বাচ্চাও বের হলো গাড়ি থেকে, সাথে তার বিরক্ত মা। সবমিলিয়ে বিশাল অবস্থা। আমি বুঝলাম, বন্ধুর হতাশার কারণটা কি!
এই ঘটনার পর থেকে আমি কোন পরীক্ষায় আর বাবা-মা বা আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে যাই না। একাই চলে যাই। অনেক শান্তি, আসলেই!

পরীক্ষার কথাই যখন আসলো, তখন পরীক্ষার একটা অসাধারণ টেকনিকের কথাই শোনাই তোমাদেরকে। তোমরা যখন হাসো, তখন তোমাদের একটা হরমোন কাজ করে। হরমোনের নাম হচ্ছে ডোপামিন। তো এই ডোপামিন যখন কাজ করতে শুরু করে, তখনই তুমি হাসো। তোমার এই হাসিটা কিন্তু হয়ে উঠতে পারে অন্যের নার্ভাসনেসের কারণ!

ধরো তোমার বন্ধু যদি তোমাকে এসে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "দোস্ত, পড়া কদ্দুর?" সে তোমার কাছ থেকে আশা করবে একটা নেতিবাচক উত্তর,

যে তুমি বলবে কিচ্ছু পড়ো নাই, তাতে তাঁর একটা মানসিক প্রশান্তি আসবে। তুমি যদি তাকে উলটো হেসে বলো, যে দোস্ত সব পড়েছি, সব পারি- তাহলে কিন্তু সে নার্ভাস হয়ে যাবে! সে যদি তোমার প্রতিদ্বন্দী হয়, তার উপরে এই কৌশল প্রয়োগ করতেই পারো, তাই নয় কি?

পরীক্ষার বিষয়টা খুব মজাদার ছিল একটা সময়ে, এখন কেমন যান্ত্রিক হয়ে গেছে সবকিছু। আমার এখনো মনে পড়ে, একটা সময় পরীক্ষা হতো উৎসবের মতো। সেই দিনগুলোকে খুব মিস করি এখন, বড় হয়ে গিয়েছি বলেই মনে হয়!

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন গড়ে তোলো এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রম দিয়ে

পড়ালেখা শেষ করার পরপরই চাকুরির চিন্তা। আর এই চাকুরি পেতে গেলে কিছু বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। আমি দেখেছি, এই প্রজন্মের অনেকেই পড়ালেখার পাট চুকানোর পরে চাকুরির সন্ধানে গেলে চরম হতাশাজনক একটা চক্রে পড়ে যায়। চক্রের নাম এক্সপেরিয়েন্স চক্র।

এই চক্রের শুরুটা হয় প্রথম জব এপ্লিকেশনের সময়ে। জবদাতা প্রতিষ্ঠান সবার আগে অভিজ্ঞতা বা এক্সপেরিয়েন্স খোঁজে। কিন্তু সদ্য পড়ালেখা শেষ করা ছেলেটি কী করে বা কোথা থেকে পাবে এত এক্সপেরিয়েন্স? এই প্রশ্নটা থেকেই যায়, আর ঠিক সেই কারণেই চাকরি আর মেলে না।

চক্রের শুরু কিন্তু হয়ে গেছে। ছেলেটিকে চাকরি পেতে হলে তার দরকার হবে এক্সপেরিয়েন্সের, কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স পেতে হলে তো তাকে চাকরি পেতে হবে সবার আগে! এ যেন সেই গল্পের ডিম আগে না মুরগি আগে এর মত অবস্থা! অনেকেই এই চক্রের ঘুরপ্যাচে আটকে যায়, সহজে আর বের হতে পারেই না!

এমন একটা চক্র থেকে বের হতে চাইলে কী করা দরকার? কীভাবে মেলে মুক্তি? প্রশ্নটা রয়েই যায়। আর এই প্রশ্নের উত্তর হলো ক্লাব, ফোরাম আর অর্গানাইজেশন। পড়ালেখা করার সময় তুমি যদি শুধু পড়ালেখাই করো, অন্যান্য কোনকিছুতে চোখ না দিয়ে, তাহলে দিনশেষে ওই আধা পৃষ্ঠার সিভি আর অভিজ্ঞতার অভাব নিয়েই বসে থাকতে হবে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এগুলোর পাশাপাশি ক্লাবগুলোর গুরুত্ব অনেক!

হয়তো তোমার মনে হতে পারে, ক্লাবে গেলে তো শুধু শুধু সময় নষ্ট, সেখানে গিয়ে শেখার আবার কী আছে? মজার ব্যাপার হলো, ক্লাব বা ফোরাম কিংবা কোন সংস্থা থেকে তুমি যতো কিছু শিখতে পারবে, পাঠ্যবইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে তার সিকিভাগ শিখবে কি না, সন্দেহ!

ক্লাব বা কোন অর্গানাইজেশন সবার আগে তোমাকে যেটা শেখাবে সেটা হলো দায়িত্ববোধ। তোমাকে একটা কাজ দেয়া হলে কতোটুকু দায়িত্বের সাথে সেটা করছো তুমি, তার উপর নির্ভর করে তোমার কতোটুকু অভিজ্ঞতা হলো। আবার একসাথে একটা টিমে কাজ করার যে টিমওয়ার্ক, যেকোন জব ইন্টারভিউতে এই দক্ষতাটা খুবই দরকারি। এর পাশাপাশি সৃজনশীলতা, বুদ্ধির ব্যবহার থেকে শুরু করে আরো হাজারো কাজ শিখে নিতে পারো তুমি এগুলো থেকে। পড়ালেখাময় বোরিং জীবনে এইটুকুও যদি না করো, অভিজ্ঞতা আসবে কোত্থেকে?

হ্যা, এটা সত্যি যে তুমি যখনই কোন ক্লাব বা ফোরামে থাকবে, সেখান থেকে তুমি কোন টাকা পাবে না। সেটা কিন্তু মোটেও মুখ্য বিষয় না! এই ক্লাব বা সংস্থার যখন তুমি যাবে, সেখানে তুমি যে স্কিলগুলো পাবে, সেগুলো কিন্তু অন্তত টাকা দিয়ে কেনা যায় না, সেগুলোকে অর্জন করতে হয় নিজের শ্রম দিয়ে। এই লেখাটায় আমি এরকম ৫টি স্কিলের কথা বলবো।

১. অর্গানাইজিং স্কিল:

তুমি একটা ক্লাবে যখন কাজ করবে, তখন সেখানে তোমাকে হরেক রকম ইভেন্ট নামাতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন ইভেন্টের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে হবে। বেশ খাটাখাটুনি হবে তাতে, আর সাথে তোমার অভিজ্ঞতার ঝুলি বাড়তে থাকবে। তুমি কাজ করে একটা ইভেন্ট নামিয়ে ফেলছো, সেটা সফল হচ্ছে, ভাবতেই অসাধারণ লাগছে না? এই অর্গানাজিং স্কিলটা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই বানিয়ে ফেলা, এর থেকে ভালো সুযোগ আর নেই।

২. টিমওয়ার্কিং স্কিল:

তুমি এর আগে হয়তো অনেক কম্পিটিশন জিতেছো, অনেক কাজ করেছো, কিন্তু সেগুলো একা একাই। সবাই মিলে একটা কাজ সফলভাবে করে ফেলার যে একটা ভালো লাগা, সেটা তুমি বুঝতে পারবে কোন ক্লাব বা ফোরামে কাজ করলে। একটা টিমে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা এতো বেশি কাজে লাগবে চাকুরি জীবনে, তোমার কোন ধারণাই নেই! কারণ একটা অফিসে টিমওয়ার্ক ছাড়া কোন কাজ কি চলে?

৩. নেটওয়ার্কিং স্কিল:

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন ক্লাবে নিয়মিত হলে যে বিষয়টা হয়, প্রচুর মানুষের সাথে খাতির জমে, অনেকের সাথে পরিচয় হয়। এতে নেটওয়ার্কিংটা অনেক বেশি দৃঢ় হয়। এদের মধ্যেই কেউ হয়তো জীবনে অনেক সফল হয়ে বিশাল কিছু করে ফেলবে, আর তুমি হয়তো কোন এক জব ইন্টারভিউতে তাকেই পাবে ইন্টারভিউ বোর্ডের ওপাশে! তাতে আর যাই হোক, তুমি নির্ভয়ে, টেনশন ছাড়াই ইন্টারভিউ দিয়ে আসতে পারবে, তাই নয় কি?

৪. লীডারশিপ স্কিল:

বলা হয়, কোন একটা চাকুরিতে উপরে ওঠার সিঁড়ি হচ্ছে নিজের লীডারশিপ স্কিল দেখানো। তোমার অফিসের বস যদি তোমার মধ্যে দায়িত্বশীলতা আর এই লীডারশিপটা দেখতে পারে, তোমার প্রমোশন ঠেকায় কে? আর এই স্কিলটা অর্জন করতে পারবে ক্লাবের মধ্য দিয়েই। একটা ক্লাবের হয়ে তোমাকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে হতে পারে। এই কাজগুলো করতে গিয়ে যদি তুমি শিখে নিতে পারো নেতৃত্ববোধের এই স্কিল, তাহলেই কেল্লাফতে!

৫. কর্পোরেট স্কিল:

আমার চোখে এই স্কিলটা খুব বেশি দরকারি কোন অফিসে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে। বর্তমান যুগ হয়ে যাচ্ছে কর্পোরেট যুগ, সবাই মূলত এই কর্পোরেট স্কিলগুলো দেখে যখন কোন চাকুরি দিতে হয় বা প্রোমোশন দিতে হয়। আর এই কর্পোরেট গ্রুপিংটা হয় কোন অর্গানাইজেশনে কাজ করলে। এই গ্রুপিংটা জীবনের বাদবাকি কর্পোরেট অফিসে সবসময় কাজে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনটাকে বলা যায় জীবনের শ্রেষ্ঠ চার বছর। এই চার বছরে তুমি যদি সারাদিন পড়ালেখা করেই কাটিয়ে দাও, তাহলে কী লাভ? বরং, ক্লাব বা অরগানাইজেশন কিংবা যেকোন ফোরামের হয়ে কাজ করতে থাকলে তুমি কাজ শিখবে, পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আনন্দটাও পেয়ে যাবে!

Sunk Cost-কে 'না' বলো, সাফল্যের পথে এগিয়ে চলো!

আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম, তখন আমার খুব প্রিয় একটা কাজ ছিল হরলিক্সের বয়ম থেকে হরলিক্স চুরি করে খাওয়া। খুব মজা লাগতো খাবারটা, আর আম্মু খালি খালি হরলিক্স খেতে দিতেন না। তো একদিন হলো কি, গোপনে হরলিক্স চুরি করতে গিয়ে আম্মুর কাছে ধরা খেয়ে গেলাম। আম্মু বেশ ক্ষেপে গেলেন।

না, ক্ষেপে গিয়ে আম্মু অনেকগুলো ঝাড়ি দেন নি। তিনি যেটা করলেন, সেটা আরো আশ্চর্য। তিনি পুরো বয়মটা আমার সামনে এনে বললেন, "খা এবার। পুরো বয়মটা আমার সামনে শেষ করবি তুই"। রাগের মাথায় তিনি যেটা করলেন, এটার একটা নাম আছে। তার আগে আরেকটা কাহিনী বলি। এটা আমার ভাইয়ের ছোটবেলার গল্প।

আমার ছোটভাই, সাদমান যখন ছোট ছিল, তখন ওর কোকাকোলা খুব প্রিয় ছিল। তো একদিন হলো কি, বাসায় কোকের বোতলে অল্প একটু কোক ছিল। আমরা দুই ভাই দুটো গ্লাসে ভাগ করে নিলাম কোকাকোলা। আমার গ্লাসে ওর থেকে সামান্য একটু বেশি ছিল, সেটা দেখে হুট করেই ও খুব রেগে গেল, বললো "তুমিই সব কোক খাও, যাও!" বলে সে তার গ্লাসের কোকটাও আমার গ্লাসে ঢেলে দিয়ে চলে গেল। আমার লাভই হলো আখেরে, বেশি কোক পেয়ে গেলাম!

এই দুটো গল্পের মধ্যে একটা মিল আছে। মিলটা হলো, আমার মা এবং সাদমান- দুজনেই Sunk Cost করেছে। এর বাংলা করলে সম্ভবত 'ডুবে যাওয়া খরচ' হবে। এটার মানে হচ্ছে যে খরচটা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, এবং যার রিটার্ন পাবার কোন সম্ভাবনাই আর নেই।

ধরো, তুমি ব্যুফে খেতে গিয়েছো। সেখানে ৪০০ টাকা দিয়েছো। এখন যেহেতু সেখানে টাকা দিয়েছো, সেই টাকা ফেরত পাবার কোন সম্ভাবনা

নেই, সেহেতু ওই টাকাটা তোমার Sunk Cost. এখন বিষয় হলো, টাকা দিয়েছো, সেজন্যে তুমি পেটপুরে সাধ্যের বাইরে খাবে, খেয়ে নিজের শরীরের ক্ষতি করবে, বিষয়টা এমন হলে কী চলে? চলে না।

Sunk cost এর থিওরিটাই এরকম। তুমি কোনকিছুতে অনেক বেশি পরিশ্রম করছো, নিজের শ্রমের অনেকটা দিচ্ছো সেখানে। যা দিয়েছো, সেটা কিন্তু অলরেডি সেই ডুবে যাওয়া খরচ, সেটা আর ফিরে আসবে না। কিন্তু এতে যদি তুমি কোন লাভ খুঁজে না পাও, তাহলে আর সেই পরিশ্রমের জন্যে থেকে যাবার কোন দরকার নেই!

প্রথম গল্পে আমি যে চুরি করে আম্মুর হরলিক্স খেতাম, এটা আমার আম্মুর জন্যে Sunk Cost। কিন্তু আম্মু সেই খরচের কারণে রাগ করে যে আমাকে পুরো বয়মটাই দিয়ে দিলো, তাতে কি লাভ হলো কোন? হলো না। আখেরে সেই খরচটাই বেড়ে গেলো আবার।

দ্বিতীয় গল্পে সাদমানও একই ভুল করে বসলো। এখানে আমার যে সামান্য একটু কোক বেশি ছিল, সেটাই ছিল ওর ডুবে যাওয়া খরচ। এই খরচটুকুর জন্যে ছেলেটা তার পুরো কোকই আমাকে রাগ করে দিয়ে দিলো। এতে লাভটা কার হলো? আমার নিজেরই। সাদমানের এই সিদ্ধান্তটা তাই ভুল ছিলো, বলতেই হয়।

এতকিছু বলার একটাই উদ্দেশ্য, Sunk Cost কে নিয়ে যাতে আমরা না ভাবি। অনেককেই আমি দেখেছি, একই চাকরিতে বা অর্গানাইজেশনে পড়ে আছে শুধুমাত্র কয়েক বছর ধরে সে সেখানে আছে, এই কারণে। এই অনেকদিন ধরে থাকাটাও এক ধরণের Sunk Cost, আর এই খরচের জন্যেই অনেকের আটকে যায় ভবিষ্যৎ!

ডুবে যাওয়া এই যে খরচ, একে আসলে খুব বেশি পাত্তা দেবার কিছু নেই। এমন খরচ থাকবেই, আর তাই এই খরচকে এক পাশে রেখে নিজের যেটা ভালো, সেইদিকে লক্ষ্য রাখলে তবেই না সাফল্য আসবে!

ইন্টারভিউয়ের কথকতা

বেশ কিছুদিন আইবিএর জন্যে একটা কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতা করার কারণে অনেকগুলো মক ইন্টারভিউ বা ছায়া ইন্টারভিউ নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এরপরে তো টেন মিনিট স্কুল, সেখানকার ইন্টার্ন এবং অন্যান্যদের ইন্টারভিউ নিতে নিতে পুরো বিষয়টা নিয়ে এক ধরণের আইডিয়া হয়ে গেছে। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য অবশ্য কীভাবে ইন্টারভিউ নিতে হয় সেটি নিয়ে নয়, আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকদের ইন্টারভিউ বোর্ডে কীভাবে সহজভাবে সুন্দর ভাষায় কথা বলা যায় তা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করা:

১. নিজেকে জানো:

প্রায় সব ইন্টারভিউ বোর্ডেই এই প্রশ্নটা সাধারণ থাকে- "Introduce Yourself". মজার ব্যাপার হলো অতি কমন এই প্রশ্নে অনেকেই ঘাবড়ে যায়, নিজেকে ঠিক কীভাবে প্রকাশ করবে সেটাই বুঝে উঠতে পারে না। ফলাফলে তাঁদের ইন্টারভিউটা ওই শুরুতেই শেষ হয়ে যায়। মূলত একটা ইন্টারভিউয়ের শুরুর এক মিনিট বা তারচেয়েও একটু কম সময় পাবে তুমি। এই সময়ে নিজেকে যতটুকু ফুটিয়ে তোলা যায়, এ সময়ে নিজেকে যেভাবে দেখাতে পারো তুমি, বোর্ডের ওপাশের মানুষটি ততোটাই ইমপ্রেসড হবেন।

নিজেকে নিয়ে বলার ক্ষেত্রে যদি তুমি এভাবে শুরু করো, যে তোমার নাম অমুক, তোমার বাবার নাম তমুক, তুমি ওই স্কুল ওই কলেজে পড়েছো, তোমরা কয় ভাই বোন- তাহলে কিন্তু সেটা আর নিজের পরিচয় না, পরিবারের পরিচয় হয়ে গেল! এবার হয়তো তোমার মনে খটকা লাগছে, তাহলে কী বলবো? কীভাবে পরিচয় হবে আমার?

তুমি তোমার নিজের বিষয়গুলো বলবে। তোমার শখ কী, কীসে কীসে পারদর্শী তুমি, প্রফেশনাল স্কিল কী কী আছে তোমার, কো কারিক্যুলার

কোন কাজগুলোতে তুমি সেরা, তোমার স্বপ্ন কী- এসব নিয়ে বলতে পারো। পাশাপাশি যদি একটু নিজের টার্গেটটা ফোকাস করে সেটা নিয়েও বলতে পারো, তাহলে তো সোনায় সোহাগা!

২. সম্মান দেখাও, কিন্তু মাটিতে মিশে যেও না:

ভাইভা নিতে গিয়ে আমি প্রায়ই খুব ইন্টারেস্টিং কিছু মানুষকে দেখেছি। এদেরই একজন একদিন এসে বললো, "ভাইয়া কাল আমার মক ভাইভা, একটু সাজেশন দেন কীভাবে কী করবো"। আমি তো স্বভাবতই বলে দিলাম যে সোজা হয়ে সুন্দর করে কথা বলবা, স্মার্টলি থাকবা। পরদিন।

সেই ছেলেকে ডাকা হলো। ছেলে দেখি একেবারে ঠায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বসতে বললাম, সে বসে না! প্রশ্ন করলাম আমরা তিনজন, সে সব প্রশ্নের উত্তর একদিনে তাকিয়ে দিলো, এক চুল পর্যন্ত নড়লো না! বিষয়টা অদ্ভুত, আমি তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কেন সে এইরকম করছে। সে মাথাটা একেবারে উটপাখির মতো নিচু করে ফেলে একটা উত্তর দিলো।

উত্তরটা আরো উদ্ভট। তার ভাষ্য, এতে সে সম্মান দেখিয়েছে মাননীয় ইন্টারভিউয়ারদেরকে!

আরেকজনকে পেলাম, সে আবার আমার পাবলিক স্পিকিং শুনে বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছে। সে ইন্টারভিউ বোর্ডে আসলো, এবং তারপরে দেখা গেল যে আমার প্রিয় ছাত্র হাত পা নাড়িয়ে বিচিত্রভাবে উত্তর দিচ্ছে। প্রশ্ন করলাম, "তোমার স্বপ্ন কী? সে উত্তর দিলো, "চমৎকার প্রশ্ন করেছেন স্যার, এর উত্তর রেডি আছে আমার কাছে!"

এভাবে যদি কেউ ইন্টারভিউ দেয়, তাহলে বুঝতেই পারছো, ফলাফল কী হতে পারে! খেয়াল করে দেখবে, এরকম ছোট ছোট ভুলের কারণেই কিন্তু তোমার চাকরি বা অ্যাডমিশন রসাতলে চলে যেতে পারে, হতাশ হয়ে যেতে পারো তুমি!

৩. বডি ল্যাংগুয়েজকে কাজে লাগাও:

একটা ইন্টারভিউ বোর্ড তোমাকে কথাবার্তা ছাড়াও, বাহ্যিক অবয়ব বুঝে জাজ করে ফেলতে ঠিক কতোটুকু সময় লাগে জানো? ৭ সেকেন্ড। হ্যা,

তুমি কোন কথা বলার আগেই, রুমে ঢুকে চেয়ারে বসা পর্যন্ত যে সময়টা যায়, সেখানেই তোমার অনেক কিছুই বুঝে নিতে পারে বোর্ডের মানুষেরা। ঠিক এই কারণেই দুটো জিনিস খুব দরকার ইন্টারভিউতে গেলে। একটা হচ্ছে ঠিকঠাক গেটআপে যাওয়া। ধরো, ইন্টারভিউতে যদি তুমি নোংরা একটা শার্ট পরে যাও, সেটা যদি ইস্ত্রি না করা থাকে, জুতার বদলে যদি স্যান্ডেল পরে যাও—এগুলো অবশ্যই চোখে পড়বে বোর্ডের মানুষদের। তারা খুব সূক্ষভাবে তোমাকে জাজ করে বসবে, আর সেখানে তোমার কিছুই করার থাকবে না!

আরেকটা বিষয় হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি কীভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলছো, কীভাবে হাটছো, প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তোমার ভাবভঙ্গি কেমন কিংবা প্রশ্নগুলো তুমি হাত পা নাড়িয়ে দিচ্ছো, আত্মবিশ্বাসের সাথে দিচ্ছো কি না- এসবই কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ডে দেখা হয়। আর ঠিক এজন্যেই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এত দরকারি একটা বিষয়!

ইন্টারভিউ বোর্ড খুবই অদ্ভুত একটা জায়গা। তুমি নিজের মতো করে সব প্রশ্নের উত্তর দিলে তোমাকে রোখার সাধ্যি নেই কারো। কিন্তু এই যে, আজকের লেখাটার মত কমন কিছু বিষয় খেয়াল রাখতেই হবে। তবেই না তুমি পারবে সেরা একটা ইন্টারভিউ দিতে!

এখনই লিখে ফেলো তোমার সিভি!

আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একটা সমস্যা খুব প্রকট। এই সমস্যাটা অনেকদিন থেকেই হয়ে আসছে, আর এর কোন প্রতিকারও দেখি নি এখনো। সমস্যাটা হলো, আমাদের প্রজন্ম মনে করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে সিভি লেখার কোন দরকার নেই, পড়ালেখার পাট চুকিয়ে, চাকুরির সন্ধান করার সময়ে সিভি লিখলেই তো চলে!

এই ধারণাটা যে কতোটা ভুল, সেটা একটা গল্প দিয়ে বলা যায়।

গল্পটা এমন, ধরা যাক রাশিক আলম নামের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে নিয়ে এই গল্প। ছেলেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তার বিষয়টা নিয়ে বেশ একটা গর্ববোধ কাজ করে। আশেপাশের কিছু বন্ধুদের যখন যে দেখে ক্লাবিং করে বেড়াতে, কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ করতে, সে তখন ভাবে–কী দরকার? পড়ালেখা শেষ করেই এসব করা যাবে খন!

রাশিকের বন্ধুবান্ধবরা সিভি বানিয়ে ফেলে, আর সে তার ওই ধারণায় পড়ে থাকে–সিভি থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম সে করে ফেলবে পড়ালেখা শেষ করে। এক্সট্রা কারিকুলার কোনকিছুতেও সে নেই, সে শুধু নাকমুখ গুঁজে পড়ালেখা করে, ওইটুকুই।

যাহোক, একটা সময়ে পড়ালেখা শেষ হয় তার। সে শুরু করে চাকরি খোঁজা, সিভি বানানোর কাজটাও শুরু করে ফেলে সে। সিভি বানাতে গিয়ে সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করে, তার সিভিটা আসলে আধা পৃষ্ঠাতেই আটকা পড়ে গেছে। সে চেষ্টা করে ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে একটু বড় করতে, তাতে হয়তো টেনেটুনে এক পৃষ্ঠার একটা সিভি হয়, কিন্তু সেটা মোটেও খুব ভালো কিছু হয় না।

রাশিক একটা সময়ে গিয়ে খেয়াল করে, যে সব সিভিতেই এচিভমেন্ট, এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজ আর জব এক্সপেরিয়েন্সের কথা লেখা আছে। কিন্তু সে তো এগুলোর কোনটাই করে নি! তাহলে তার সিভি কী করে ভালো হবে?

সত্যি বলতে কী, তার সিভি এখন আর ভালো করার কোন সুযোগ নেই। তবে, এই লেখাটা যারা পড়ছো, তোমাদের খুব ভালোভাবেই এই সুযোগটা রয়েছে, আর সেটা হেলায় হারানো মোটেও উচিত না। একটা কাজ এখানে করা খুব কার্যকর হবে।

তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া হয়ে থাকো, তাহলে প্রথম বর্ষেই সিভি বানিয়ে প্রতি সেমিস্টারে নতুন করে সিভিটাকে আপডেট করতে থাকো। যদি এক সেমিস্টারে সিভিতে নতুন কিছুই যোগ না হয়, তাহলে সেটা তোমার জন্যে একটা অশনি সংকেত, যে ওই সেমিস্টারে তুমি করার মতো কিছুই করো নাই! নিজের সিভির দিকে তাকালেই বুঝে ফেলতে পারবে পুরো সেমিস্টারে তুমি কী কী করেছো আসলে!

সিভি লেখার সময় খুব কমন কিছু ভুল করে এই প্রজন্ম, সেগুলো নিয়েও একটু বলা দরকার:

১. প্রথম ভুল:

সিভিতে যে ছবিটা দাও তোমরা, তাতে দুই ধরণের ভুল থাকে। প্রথমত, সিভি হতে হয় ফরমাল ছবির। এখন তুমি যদি সিভির ছবিতে নিজের গোয়ালঘরের পাশে সানগ্লাস পরা ছবিটা দাও, সেক্ষেত্রে সেটা তো আর নেয়া যাবে না! আরেকটা সমস্যা হচ্ছে পুরনো ছবি দেয়া। হ্যা, এটা হতে পারে যে তোমার সম্প্রতি কোন পুরনো ছবি দেয়া হয় নাই। তার মানে কিন্তু এটা না যে তুমি এমন একটা ছবি দিবা যেটা দেখে তোমার সাথে মিলের চেয়ে অমিল বেশি পাওয়া যাবে! তাই ছবি দিতে হবে ফর্মাল, ছবি হতে হবে সাম্প্রতিক, যেখানে তোমাকে চেনা যাবে।

২. দ্বিতীয় ভুল:

এখনো অনেক সিভিতে মেইল এড্রেসে দেখা যায় angelfaria@gmail.com কিংবা bossbabzrakib@yahoo.com এরকম ছেলেখেলার মতো করে যদি সিভি দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে ওই সিভিটা সিলেক্ট হবার সম্ভাবনা যে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, সেটা তো বুঝতেই পারছো! ইমেইল আইডিতে যাবে নিজের নাম। সেখানে এসব উদ্ভট নাম দিলে আসলেই সম্ভাবনাটা আর থাকে না।

ঠিক এই কারণেই ইমেইল আইডির নামটা ঠিকঠাক উপায়ে লিখতে হয়। কঠিন কোন কাজ তো আর না, নিজের ইমেইল আইডিতে নিজের নামটাই লিখে দিলে সমস্যা হবার তো কথা না!

৩. তৃতীয় ভুলঃ

সিভিতে তুমি একাডেমিক ক্যারিয়ার যখন দেবে, তখন সেটা অবশ্যই হতে হবে সাম্প্রতিক থেকে পুরনো। শুরুতেই যদি এসএসসি দিয়ে রাখো, সেটা তাহলে আর সিভির ফরম্যাট হলো না। এই বিষয়টা তোমাদের কাছে হয়তো নতুন, কিন্তু শেখার জন্যে মহা দরকারি। একাডেমিক ক্যারিয়ারের শুরুতেই থাকবে তুমি এখন কীসে পড়ছো, সেটা। তারপরে তার আগের একাডেমিক ডিগ্রি, তারপরে তারও আগেরটা। এভাবেই উলটো করে চলবে সিভির একাডেমিক সিরিয়াল।

তাহলে আর দেরি কেন? নিজের একটা সুখী আর সুন্দর ক্যারিয়ার গড়তে এখনই বসে যাও সিভি বানাতে! ভালো একটা সিভিকে না করার সাধ্যি আছে কার?

ফেসবুকের সঠিক ব্যবহার করে হয়ে ওঠো আদর্শ নাগরিক!

ফেসবুক ব্যবহার করে না, বাঙ্গালি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই সংখ্যাটা দিনকে দিন এত অস্বাভাবিক হারে কমে আসছে যে কিছুদিন পর হয়তো আঙ্গুলের কর গুনে বলে দেয়া যাবে ফেসবুকে এখনো কোন তরুণ আসক্ত হয় নি! ফেসবুক অনেকদিন ধরেই আর নিছক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নয়, একে এখন বলা চলে ভার্চুয়াল একটা জগত, নীল সে জগতে বাস করছে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ। এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে কেবলমাত্র বিনোদনের কাজে না লাগিয়ে একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু আমরা ফেসবুককে বানিয়ে ফেলতে পারি কার্যকর একটা জায়গা, যেখান থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে চাইলেই! আজ বলবো এরকম কিছু উদ্যোগের কথা।

১. ফেসবুক সাংবাদিকতাঃ

ফেসবুকের সাংবাদিক হবার সবথেকে ভালো বিষয়টা হচ্ছে যে তোমাকে কোন সাংবাদিকতায় ডিগ্রি নিতে হয় না। তোমার স্ট্যাটাস বারই হচ্ছে তোমার সংবাদ, ফেসবুকের নিউজ ফীড হলো সেই সংবাদপত্র। চারপাশে কিন্তু প্রচুর অসঙ্গতি দেখো তুমি। দেখারই কথা। হয়তো এগুলো দেখে হতাশ হয়ে চলে যাও তুমি। কিন্তু চাইলেই তুমি এর প্রতিবাদ করতে পারো, চাইতেই পারো একটা সুন্দর পৃথিবীর। যেটা করতে হবে, সেটা হলো এই ফেসবুককে কাজে লাগিয়ে শুরু করে দাও প্রতিবাদ!

তোমার এলাকায় ডাস্টবিন নেই, সেটা লিখে শেয়ার করো সবাইকে, সবার প্রতিবাদে একসময় ডাস্টবিন আসবেই! ইভ টিজারদের বড় উৎপাত? ছবি আর ভিডিও করে শেয়ার করে দাও, পুলিশকে জানাও। ইভ টিজিং বন্ধ হতে বাধ্য হবে! ফেসবুককে এভাবে কাজে লাগালে জীবন হবে আরো সুন্দর।

২. রক্তদান হোক আরো সহজঃ

প্রায়ই রক্ত দেবার জন্যে বিভিন্ন রক্তদাতা সংগঠন থেকে পোস্ট আসে। এই পোস্টগুলোয় কেউ সাড়া দিতে দিতে হয়তো রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে

যায়! তুমি যদি নিজের ফেসবুকের ছোট্ট যে বায়ো অংশটা আছে, সেখানে তোমার পরিচয়ের পাশাপাশি নিজের রক্তের গ্রুপটাও দিয়ে দাও, তাহলে কিন্তু সবার জন্যেই অনেক সহজ হবে পুরো বিষয়টা! ভেবে দেখো, তোমার একটা বায়োতে ছোট্ট করে গ্রুপ লেখার কারণে হয়তো তুমি রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচাতে পারছো!

৩. সামাজিক ইস্যুতে ফেসবুক:

ফেসবুককে এখন বলা যায় মানুষের মত প্রকাশের সবথেকে কার্যকর উপায়গুলোর একটা। ফেসবুকে যেভাবে তুমি সমাজের নানা বিষয় নিয়ে বলতে পারো, সামনাসামনিও হয়তো তেমনটা হয় না। আর এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে কিন্তু গণসচেতনতা গড়ে তুলতেই পারো তুমি।

শাহবাগ চত্বরের সেই আন্দোলনের শুরুটাও কিন্তু ছিল একটা ফেসবুক পোস্ট থেকেই। আর তাই উদ্ভট অপ্রয়োজনীয় ইভেন্ট না খুলে দরকারি ইভেন্টের মাধ্যমে তুমিও গণজাগরনের শুরুটা করতে পারো!

৪. ফেসবুক শপকে কাজে লাগাও:

খেয়াল করেছো হয়তো, ফেসবুকে শপ নামে একটা চমৎকার অপশন রয়েছে। এই শপকে ব্যবহার করে কিন্তু অনলাইনে শপিং করতে পারো তুমি, কিছু বিক্রি করতে চাইলে ফেসবুকও কিন্তু দারুণ একটা মাধ্যম! ধরো তোমার একটা জার্সির দোকান আছে। তুমি যদি ফেসবুকে এই জার্সিগুলোকে শপে রাখো, তাহলে নির্দ্বিধায় তোমার দোকানের বিক্রি বাড়বে, জনপ্রিয়তাও বেড়ে যাবে!

৫. গ্রুপ চ্যাটকে বানিয়ে ফেলো শেখার মাধ্যম:

আমরা সবাই কোন না কোন ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপ চ্যাটে আছি। হোক সেটা বন্ধুদের গ্রুপ চ্যাট, হোক সেটা ডিপার্টমেন্টের কোন ক্লাবের গ্রুপ চ্যাট, কিংবা ছোটবেলার বন্ধুদের গ্রুপ চ্যাট। সেখানে আমরা সারাদিনই বিভিন্ন বিচিত্র বিষয় নিয়ে বকবক করতেই থাকি। এই গ্রুপ চ্যাটটাকে কিন্তু কোনকিছু শেখার জন্যে দারুণ কাজে লাগানো যায়!

ধরো তুমি ইংরেজি শিখতে চাও। এই গ্রুপ চ্যাটে যদি বন্ধুদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে থাকো, তাহলে তাঁদের যেমন ইংরেজির প্র্যাকটিস

হবে, তুমিও কিন্তু এই বিদেশী ভাষাটায় পারদর্শী হয়ে উঠবে! এছাড়া আরেকটা উপকার আছে এখানে। ধরো তোমার ইংরেজি দুর্বল। এমনিতে এই ভাষা প্র্যাকটিস করতে তাই লজ্জা লাগবে তোমাদের। কিন্তু বন্ধুদের মধ্যেই যদি কথা বলো, তাহলে আর লজ্জা কিসের?

ফেসবুক এখন আর কেবল বিনোদনের জায়গা নয়। আর এই ভার্চুয়াল জগতকে নিয়ে কাজ করে আদর্শ নাগরিক হতে পারলে অসাধারণ লাগবে না তোমার?

সময় নষ্টের মূলে যে ৮টি কারণ

আমাদের জীবনে সময় খুবই মূল্যবান। বিশেষত, ব্যস্ততার এই যুগে সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না। তবুও প্রতিনিয়ত সময়ের একটা অংশ নষ্ট হয়। আমরা এমন কিছু কাজে আমাদের মূল্যবান সময় দেই যেগুলো আদতে কোন কাজেই আসে না! এই সময় নষ্ট করার জন্যে বলা যায় যে ৮টা কাজ বেশি দায়ী। মজার ব্যাপার হলো, এগুলোর অনেকগুলোই আমরা প্রতিনিয়ত করে আসছি, এবং তাতে কোন সমস্যাও নেই। সমস্যা তখনই, যখন দরকারি কাজ ফেলে আমরা এসবের পেছনে সময় নষ্ট করে যাই।

১. ড্রাগসঃ

এটাকে শুধু সময় নষ্টকারী কাজ বলা যায় না। এটা একইসাথে জীবন-ধ্বংসকারীও বটে। আমি গত এক বছরে বাংলাদেশের প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ঘুরে এসেছি, শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেছি, এবং এতে একটা ভয়ংকর সত্যির দেখা মিলেছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর শিক্ষার্থী এই ড্রাগস এর নেশায় আসক্ত হচ্ছে দিনকে দিন।
হতাশা, ডিপ্রেশনসহ নানা কারণে যেখানে নতুন কোন কাজ করে মনটাকে চাঙ্গা রাখা যেতো, সেখানে এই শিক্ষার্থীরা বেছে নিচ্ছে ড্রাগসের অন্ধকার রাস্তা। আর এর ফলাফল হচ্ছে ভয়াবহ। নিজের ক্যারিয়ার তো বটেই, জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যায় অনেক সময় এই ড্রাগসের কারণে।

তোমরা যারা এই লেখাটা পড়ছো, তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, চেষ্টা করো ড্রাগস থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকার। আর তোমার কাছের মানুষগুলোকে, তোমার বন্ধুদের এই ভয়াল ড্রাগসের ছোবল থেকে দূরে রাখার চেষ্টাটাও চালিয়ে যাও। ড্রাগস মুক্ত তরুণ প্রজন্ম বাংলাদেশকে নতুন ভোর এনে দেবে, এই স্বপ্নটা কিন্তু সবারই!

২. টিভিঃ

না, টিভি দেখাকে মোটেও আমি ড্রাগসের সাথে তুলনা করছি না। আমাদের জীবনে বিনোদনের দরকার আছে, আর টিভি একটা সুস্থ বিনোদন মাধ্যম, তাই টিভি থেকে বিনোদন নেবার পাশাপাশি শেখাও যায় অনেক কিছু।

সমস্যাটা হয় তখনই, যখন এই টিভি দেখাটা হয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রণহীন। ফানি বাংলা নাটক দেখে দিন পার করে দেয়া, কিংবা নুডলস দিয়ে মুরগির রোস্ট বানানোর অনুষ্ঠানের পেছনে বড় একটা সময় লাগালে সেটা হতে পারে তোমার ক্যারিয়ারের জন্যে ক্ষতিকর।

টিভি দেখা নিয়ে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু সেটাকেও রাখতে হবে কন্ট্রোলে। ছোটবেলায় মনে আছে? আব্বু আম্মু বলতো যে দুই ঘন্টা পড়লে আধা ঘন্টা টিভি দেখতে দেয়া হবে? সেটাও দিনে একবার মাত্র? এই অভ্যাসটা ধরে রাখার চেষ্টা করো। তাহলেই সময় নষ্ট আর হবে না।

৩. গসিপঃ

"দোস্ত, জানিস? ওই মেয়েটার না এক মাসেই ব্রেক আপ হয়ে গেছে!"
"এই শোন, আবুলের ভাই হাবুল কিন্তু তোর ক্রাশের সাথে লাইন মারে!"
"সেদিন তোর গার্লফ্রেন্ডকে দেখলাম আরেকজনের সাথে রিক্সায়, কাহিনী কী? নিজের প্রেমিকাকে সামলাতে পারিস না?"

এই কথাগুলো বলতে অনেকেই অনেক মজা পায়। গসিপ করা, কুকথা-কানকথা ছড়ানো, এসব করতে অনেকেরই বেশ ভালো লাগে। সমস্যা হলো যে, এই আবুলের ভাই হাবুলের খোঁজ নিতে যে সময়টা নষ্ট হলো, এই সময়টা পড়াশোনায় বা কোন রিসার্চে দিলে অনেক কাজে লাগতো। কিন্তু, অকারণে এসব গসিপে সময় নষ্টের কারণে সেটা আর হলো কই?

বিষয়টা হলো যে, এসব গসিপ করে আদতে তোমার নিজের কোন লাভ হয় না। বরং অনেকের বিশ্বাসভঙ্গের কারণ হও তুমি, নষ্ট হয় তোমার সময়। তাই আজ থেকেই প্রতিজ্ঞা করো, এসব গসিপের কথা ছুঁড়ে ফেলে দেবে তুমি। এই সময়টা লাগাবে নিজের উপকারে, অন্যের অপকার খুঁজে নয়!

৪. ফেসবুকঃ

এখানে তোমার একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। ফেসবুক এমন একটা জায়গা, যেখানে তুমি চাইলে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারো অন্যের প্রোফাইলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে বা কারো সাথে চ্যাটিং করে। আবার এখানেই তুমি এরকম কার্যকর কোন লেখা পড়তে পারো, চাইলেই বিভিন্ন দরকারি ইভেন্টে মানুষের কাজে আসতে পারো।

এজন্যে ফেসবুকের পেছনে যেটুকু সময় তুমি দাও, চেষ্টা করবে সেটি যেন তোমার কাজে লাগে। এঞ্জেল তামান্নাকে হাই দিয়ে চ্যাট শুরু করে সময় নষ্ট না করে, ফেসবুককে কাজে লাগাও। তাহলেই দেখবে তোমার সময় আর নষ্ট হচ্ছে না।

৫. ইউটিউবঃ

"কিন্তু ইউটিউবে তো টেন মিনিট স্কুলের ভিডিও দেখি, সেটাও কী সময় নষ্টের কারণ?"

এমন প্রশ্ন যদি মাথায় চলে আসে, তাহলে এটা জেনে রাখো, যে ফেসবুকের মতো ইউটিউবও এমন একটা জায়গা, যেখানে তুমি রাতদিন কাটিয়ে দিতে পারো ফানি ক্যাট ভিডিও বা ট্রেন্ডিং ভিডিওগুলো দেখে। আবার, এখানেই তুমি চাইলে বিশ্বের যেকোন বিষয় নিয়ে ক্লাস দেখতে পারো, শিখে নিতে পারো অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের খুঁটিনাটি।

তাই ইউটিউবকে আমি বলবো না সময় নষ্টের কাজ, কিন্তু অযথা র‍্যান্ডম ভিডিও, যেগুলো তোমার কোন কাজেই আসছে না- এমন ভিডিও দেখে সময় নষ্ট করো না। সেসব ভিডিওই দেখো, যেগুলো তোমার কাজে দেবে। হ্যা, বিনোদনের ভিডিওর দরকার আছে। কিন্তু তোমার মূল্যবান সময়ের সবটাই ফানি ভিডিওর পেছনে ব্যয় করো না।

৬. আড্ডাবাজিঃ

বন্ধু ছাড়া জীবন অচল, বন্ধুদের সাথে বসে 'চিল' না করলে ভালোই লাগে না- এরকম মনে হয় অনেকেরই। সত্যি কথা বলতে কি, বন্ধুদের সাথে ঘোরাফেরায় যে বিনোদনটা হয়, সেটা অনেক কাজে দেয়। কিন্তু এই আড্ডাবাজি যদি তোমার দিনের সিংহভাগ সময় নিয়ে নেয়, তাহলে সেটা হবে সময় নষ্টকারী কাজগুলোর অন্যতম।

বন্ধুদের সময় দিতে হবে, সেটা তোমার জন্যে দরকারি। কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবেই, যে দিনের কাজগুলোও যেন ঠিকভাবে হয়, আড্ডা মারা বা 'চিল' করতে গিয়ে যেন তোমার দরকারি কাজগুলো পড়ে না থাকে।

৭. গেমস:

কম্পিউটার গেমস বলো, বা মোবাইল গেমস- এগুলো যদি তোমার নেশায় পরিণত হয়, এগুলোর কারণে যদি তোমার দৈনন্দিন কাজ আটকে যায়, তাহলে এগুলোকে অবশ্যই সময় নষ্ট করে এমন কাজের লিস্টে রাখা দরকার। হ্যাঁ, গেমস খেললে অনেকসময় মাথা পরিষ্কার হয়, তোমার কাজকর্মে দ্রুততা আসে। কিন্তু এই গেমসই যদি তোমার জীবনে নেশার আরেক নাম হয়ে পড়ে, তাহলে এগুলো খেলা কমিয়ে দেয়া উচিৎ।

৮. টিভি সিরিজ:

টিভি সিরিজ দেখা বর্তমান সময়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খুব বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। গেম অফ থ্রোনস, ব্রেকিং ব্যাড, পার্সন অফ ইন্টারেস্ট- বাহারি নামের চমৎকার এই সিরিজগুলো একবার শুরু করলে আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না। এক একটা এপিসোডের পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা তো আছেই!

টিভি সিরিজ আমারও খারাপ লাগে না, সময় পেলে, একটু বিনোদনের দরকার হলে আমিও চোখ বুলাই টিভি সিরিজে। বুদ্ধি প্রখর হয়, মনের শান্তিও আসে। কিন্তু ওই যে, সময় পেলে, হাতে কাজ না থাকলে তখনই। সব কাজ ফেলে যদি টানা টিভি সিরিজ দেখতে বসে যাও, আর তার রেশ যদি সারাদিন থাকে, তাহলে টিভি সিরিজ দেখা কমিয়ে ফেলা উচিৎ তোমার। মনে রাখবে, আগে দরকারি কাজ, তারপরে বিনোদন। এর উল্টোটা যেন না হয়!

আমার এই লেখাটার উদ্দেশ্য কিন্তু মোটেও তোমাদের আদর্শ অভিভাবক হয়ে জ্ঞানী জ্ঞানী কথা শোনানো নয়! তরুণ প্রজন্মের একজন হিসেবে আমি জানি, আমাদের জীবনে বিনোদনের কতোটা দরকার। আমার কথা একটাই, আর সেটা হলো তুমি বিনোদন নাও, কিন্তু সেটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। পড়ালেখা ও দৈনন্দিন দরকারি কাজের সাথে মিলে মিশে যদি বিনোদনও নিয়ে নিতে পারো, তবেই না তুমি সুখী সফল মানুষ হবে!

সময় ব্যবস্থাপনার ৫টি কার্যকর কৌশল

ডিজিটাল এই যুগে আমাদের মধ্যে যে সমস্যাটা দেখা যায়, সেটা হলো যে আমরা ফেসবুক-ইউটিউব-স্ন্যাপচ্যাট এবং এরকম সব সাইটের ভীড়ে কাজের সময়টা ঠিক করে উঠতে পারি না। একবার ভেবে দেখো তো, ঘুম থেকে উঠে ফেসবুকের নিউজ ফীডে যে সময়টা নষ্ট হয়, সেটা অন্য কাজে লাগালে কিন্তু বিশাল কোন কিছু হয়ে যেতে পারতো!

ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলাটা দরকার, যেহেতু যুগটাই এমন। কিন্তু সেজন্যে নিজের ক্রিয়েটিভিটি খোয়ালে তো আর চলবে না! আর ঠিক এই কারণটার জন্যেই শিখে নিতে হবে কিছু টাইম ম্যানেজমেন্ট বা সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল। না, এগুলো খুব কঠিন নয়, বরং প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এটা এখন সহজ থেকে সহজতর কাজগুলোর একটা! আজ বলবো এরকমই ৫টি কৌশলের কথা, যেগুলো কাজে লাগালে কার্যকরী ডিজিটাল লাইফ চালাতে পারবো আমরা সবাই।

১. মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন অফ রাখা:

বন্ধুবান্ধবের তো কমতি নেই আমাদের। আর যতো বেশি বন্ধু, ততো বেশি নোটিফিকেশন। মেসেঞ্জারে রাতভর চ্যাট, আর তার ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু কাজ, যেগুলোকে নামমাত্রই ধরা যায়। মেসেঞ্জারের গ্রূপগুলোয় তো সবসময় কেউ না কেউ কথা বলতেই থাকে!

এতে যেটা হয়, দরকারি কোন কাজ করার সময় ব্যাপক একটা বাধার সৃষ্টি করে এই মেসেঞ্জারের কথাগুলো। ধরো তোমার সামনে পরীক্ষা, তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা করছো। হুট করে চোখ পড়লো কোন এক বন্ধুর মেসেজে, তুমি গল্প শুরু করলে। গোল্লায় গেল পরীক্ষা, এক ঘন্টা পর তুমি নিজেকে ওই মেসেঞ্জারেই আবিষ্কার করবে!

এইজন্যে খুব কাজের একটা উপায় হচ্ছে নোটিফিকেশন অফ করে রাখা। দরকারি কেউ হলে সে মেসেজ দিয়ে চলে যাবে, সেটা তুমি পরে ফাঁকা

সময়ে দেখে নিতেই পারো। কিন্তু অযথা কাজের সময় যাতে মনোযোগ না চলে যায়, সেজন্যে নোটিফিকেশন অফ রাখা হচ্ছে সেরা সিদ্ধান্ত।

২. দিন শুরু করার আগে দিনের কাজের একটা লিস্ট বানাও:

প্রতিদিনে হরেক রকম কাজ থাকে আমাদের। কীভাবে শুরু করবো, কোনটা আগে করবো, বা কী কী কাজ করবো সবকিছু কিন্তু মনে থাকে না আমাদের। এগুলো মনে না থাকার কারণে হুট করে রাতের বেলায় মনে হয়, "আরে! সকালে তো ওই কাজটা করার কথা ছিল!"

এই সমস্যার একটা চমৎকার সমাধান আছে, যেটা একই সাথে ডিজিটাল সময় ব্যবস্থাপনার কাজেও লাগে। তুমি যদি কম্পিউটারে বেশি থাকো, তাহলে সেখান থেকে স্টিকি নোটে লিখে রাখতে পারো দিনের কাজগুলো কি কি। আবার তুমি যদি বেশি ব্যস্ত থাকো মোবাইল ফোনে, সেখানেও টু-ডু লিস্টে দিনের সবগুলো কাজ আগের দিন রাতেই কিন্তু লিখে রাখতে পারো তুমি!

৩. মোবাইলের ওয়ালপেপার হতে পারে কাজের লিস্ট:

আচ্ছা, তোমার মোবাইলে সবথেকে বেশি কোন জিনিসটা দেখো তুমি? মেসেঞ্জার, ইউটিউব বা গেমসের নাম মাথায় আসলেও, এর উত্তর হচ্ছে ওয়ালপেপার। ফোন অন করলেই ওয়ালপেপারের রাজত্ব শুরু! তো এই ওয়ালপেপারকে মহা কাজে লাগানো যায় তোমার সময় বাঁচাতে। কীভাবে? নিজের দিনের কাজগুলো, বিভিন্ন টিপস আর ট্রিকসগুলো লিখে রাখতে পারি আমরা ওয়ালপেপার হিসেবে। তাতে যেটা হবে, তুমি ফোন খোলামাত্রই চোখে পড়বে দরকারি কাজগুলো, আর তাই সেগুলো শেষ করতে উদগ্রীব হবে তুমিও!

৪. ক্যালেন্ডারকে সহায়ক বানাও:

নিজের কাজের হিসাব রাখার জন্যে ক্যালেন্ডার অসাধারণ কাজের একটা জিনিস। একবার ভাবো তো, তুমি কোন একজনের সাথে একটা মিটিং সেট করে রেখেছো দুই সপ্তাহ পরে। তোমাদের কথা হয়েছে, কিন্তু এই দুই সপ্তাহে যে তুমি মিটিংটা পুরোপুরি ভুলে যাবে, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এজন্যেই আছে ক্যালেন্ডার।

তোমার সব প্ল্যান, সব আইডিয়া রেখে দিতে পারো ওই ক্যালেন্ডারেই। সেখান থেকে দৈনিক একবার করে যদি চেক করো, তাহলে দেখবে সবকিছু সুন্দর করে সাজানো আছে সেখানেই। বাকি কাজ একেবারেই তোমার!

৫. প্রোডাক্টিভিটি অ্যাপের 'প্রোডাক্টিভ' ব্যবহারঃ

প্রোডাক্টিভিট অ্যাপগুলো সবথেকে ভালো ব্যবহার করা যায় টাইম ম্যানেজমেন্টে। আমার পছন্দের একটা অ্যাপ হচ্ছে Wunderlist. এছাড়া গুগল ক্যালেন্ডারও অনেক কাজে লাগে এই ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন আসতে পারে, এই অ্যাপগুলো দিয়ে কী হবে? উত্তরও রয়েছে, এই অ্যাপগুলো তোমাকে তোমার বিভিন্ন কাজ বা টাস্কের হিসাব রাখতে আর আপডেট দিতে সাহায্য করে। একটা ডিটেইলড প্ল্যান রাখতে ও বানাতে এই অ্যাপগুলোর জুড়ি নেই!

প্রযুক্তির এই বিশ্ব দিনকে দিন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। এই বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তোমাকে অবশ্যই টাইম ম্যানেজমেন্ট করে চলতে হবে, আর সেজন্যেই এই টিপসগুলো দেয়া!

সমালোচনা

এমন একটা কাজ আছে, যেটা আমরা সবাই পারি, সবাই করি, সেটা যে কারো জন্যে ক্ষতিকর হয়ে যেতে পারে সেটা জানি, জেনেও করি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। কাজটার নাম সমালোচনা। এ এক অদ্ভুত বিষয়। এক সমালোচনা করে কারো উদ্যম বাড়িয়ে তাঁর উদ্দীপনাকে আকাশছোঁয়া করা যায়, আবার সেই সমালোচনাই পারে কাউকে চরম হতাশ করে তুলতে।

অবাক হচ্ছো? ভাবছো, সমালোচনা আবার উদ্যম বাড়ায় কী করে? অবশ্যই বাড়াতে পারে, কিন্তু সেজন্যে সমালোচনার ধরণটা হওয়া দরকার অন্যরকম। তোমার কোন একটা কাজ, তুমি খুব দরদ দিয়ে করেছো। সেখানকার খুঁটিনাটি ভুলগুলো কারো চোখে পড়তেই পারে, আর সেগুলো তোমাকে বুঝিয়ে সমালোচনা করলে অবশ্যই পরের কাজটা আরো ভালো করার জন্যে একরকম জেদ চেপে যাবে তোমার মধ্যে!
সমালোচনা দুই ধরণের:

১. গঠনমূলক সমালোচনা বা Constructive Criticism
২. ধ্বংসাত্বক সমালোচনা বা Destructive Criticism

গঠনমূলক সমালোচনার কথাতেই আসা যাক। মনে করো তুমি একটা ভিডিও বানালে। খুব আগ্রহ করে বানিয়েছো ভিডিওটা, মজার মজার অনেক কনটেন্ট সেখানে। তোমার প্রথম ভিডিও, তুমি খুব উত্তেজিত মানুষের রিএকশন নিয়ে। ভেতরে ভেতরে হয়তো একটু টেনশনেও আছো, কী হয় কী হয় টাইপ অবস্থা।

এরকম সময়ে তোমার কোন পরিচিত মানুষ কমেন্ট করলো, যে ভিডিও বেশ ভালো লেগেছে, তবে শেষের দিকের কনটেন্টের সাউন্ড মিক্সিং ভালো করা দরকার ছিল। তুমি কিন্তু এই একটা কমেন্ট খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে। এবং একটু পর আবিষ্কার করবে, সে তো ঠিক বলেছে! এই আবিষ্কারের পর তুমি শুরু করবে ভাবা, কীভাবে এগোলে পরের ভিডিওটা

আরো ভালো হবে, কোন পথে এগোতে হবে। তুমি পাবে উদ্দীপনা। সাথে ওই মানুষটির সাথে সম্পর্ক ভালো হবে তোমার, পরের ভিডিওতেও অপেক্ষা করবে তার আরেকটা সমালোচনার।

এই যে এই সমালোচনার অংশটা? এটাই বলতে গেলে গঠনমূলক সমালোচনা। এই সমালোচনা করতে হলে কাজটা পুরোপুরি দেখতে হয়। তারপরে নিজের মাথা খাটিয়ে সমালোচনা করতে হয়। স্বভাবতই, গঠনমূলক সমালোচকদের সংখ্যা তাই খুব বেশি না।

ধ্বংসাত্বক সমালোচকের ব্যাপারটা আবার পুরোপুরি উল্টো। এই মহামানবদের বিন্দুমাত্র মাথা খাটাতে হয় না, তেনারা একাই একশো। তাঁদের কিছু আলাদা শব্দচয়ন আছে, সেগুলোর কোন কোনটিকে গালি বললেও ভুল হবে না। এই মানুষগুলো হয়তো কাজটা পুরোপুরি দেখেও না, নাম দেখেই উটকো একটা কথা বলে রেখে দেয়।

ভিডিওর গল্পে ফিরে যাই। তোমার অনেক সাধনার ভিডিওতে যদি কেউ সুন্দর করে দুই তিন বর্ণের কিছু গালি দিয়ে বলে যে যাচ্ছেতাই ভিডিও হয়েছে, তুমি অনেক জঘন্য ভিডিও বানাও- তাহলে দুইটা বিষয় হবে। ওই সমালোচকদের তো মানুষ খারাপ ভাববেই, তাতে তাঁদের যায় আসার কথা না খুব একটা। কিন্তু তোমার উদ্দীপনায় বড় একটা বাঁধ পড়বে। মনে হবে, আসলেই মনে হয় আমি ভিডিও বানাতে পারি না, কী হবে আমার? হয়তো তুমি আর কখনোই ভিডিও বানাবে না, সে আগ্রহ হারিয়েছে কবেই!

এই যে এই সামান্য কিছু ধ্বংসাত্বক কথা- এগুলো বলে নিজের অজান্তেই Negativity ছড়িয়ে যাচ্ছে সবখানে, সব জায়গায়। এসব থেকে বের হতে হবে। কারণ এই কথাগুলোই হতে পারে কোন একজনের জন্যে হতাশার মূল!
একটা বিষয় সত্যি, যে গঠনমূলক সমালোচনা করতে মাথাটা খাটাতে হয়। একটু বুদ্ধিমান হবার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে ধ্বংসাত্বক সমালোচনা করা মানুষগুলোর মাথা তো খাটাতে হয়ই না, তারা আদতে কতোটা বুদ্ধি রাখে, এই নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই যায়!

এখন তুমিই বলো, গঠনমূলক সমালোচনা করে বুদ্ধিমানের দলে নিজেকে রাখবে, নাকি ভীড়বে নির্বোধ সমালোচকদের মধ্যে?

নিজেকে জানা, Elevator Pitch এবং আমাদের অবস্থান!

আমাদের জন্মের পর থেকে এখনও পর্যন্ত আমরা কিন্তু নিজেদেরকে নিয়েই আছি। অথচ, যদি কখনও কেউ আমাদেরকে নিজেকে বর্ণনা করে এমন তিনটা শব্দ জিজ্ঞেস করে তাহলে আমাদের ঘাম বেরিয়ে যায়। একটা ঘটনা কল্পনা করা যাক।

ভাবো তো, একবার লিফটে তোমার সাথে বিল গেটস উঠলেন!
বিল গেটসের গন্তব্য ভবনের দশম তলায়; আর তোমার কাজ তৃতীয় তলায়, বিল গেটসকে লিফটে রেখে সম্মান ও ভদ্রতার খাতিরে হলেও তোমার থেকে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তুমি আর বিল গেটস; মাঝখানে হাতে মাত্র ৩০ সেকেন্ড সময়। পুরো ব্যাপারটা তোমার হাতে!
তুমি এ সংক্ষিপ্ত সময়টাকে কেবলমাত্র বিল গেটসের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে কিংবা একটা সেলফি তুলেই শেষ করে ফেলতে পারো। এতে তোমার বা বিল গেটসের কারও কি কোনও লাভ হলো? বড়জোর, তুমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ কিছু লাইক/কমেন্ট পাবে।

অথচ, এই ৩০ সেকেন্ডে একটু কৌশল অবলম্বন করলেই হয়তো তুমি বিল গেটসের সাথে কাজ করার মতো বিশাল একটা সুযোগও পেয়ে যেতে পারতে। এই কৌশলের নামই 'Elevator Pitch.'

নামটা 'Elevator Pitch' বলে ব্যাপারটা যে কেবল লিফটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা কিন্তু নয়। এটা অন্য যে কোনও জায়গায় স্বল্প সময়ে যেকোনও ব্যক্তির সামনে নিজেকে সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রক্রিয়া। লিফটে সাধারণত আমরা খুব কম সময়ের জন্য অবস্থান করি। সে ধারণা থেকেই মূলত এ ধরণের নামকরণ।

অর্থাৎ, কখনও যদি লিফটে বা অন্য কোথাও এমন গুরুত্বপূর্ণ কারও সাথে দেখা হয়ে যায় যে কিনা তোমার কোনও উপকারে আসতে পারেন কিংবা তুমি তার সাথে কাজ করতে বেশ আগ্রহী সেক্ষেত্রে তার সামনে নিজেকে স্বল্প সময়ে যে অল্প কথায় উপস্থাপন করবে সেই ছোট্ট বক্তব্যের নামই 'Elevator Pitch.'

এখন, প্রশ্ন হলো এই 'Elevator Pitch' তৈরির উপায়গুলো কি কি?

১. খুঁজে বের করো তিনটি শব্দঃ

নিজেকে জানো। তোমাকে বর্ণনা করে করে এমন শব্দগুলোকে খোঁজার চেষ্টা করো। সেখান থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত এবং যেগুলো তোমাকে অন্য সবার থেকে আলাদা হিসেবে উপস্থাপন করে সেরকম তিনটা শব্দ বেছে নাও। যেমনঃ শিক্ষক, বক্তা, উদ্দ্যোক্তা এ তিনটি শব্দ আমাকে বর্ণনা করে।

২. কিছুটা বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করোঃ

ছোট করে লিখে ফেলো, ঐ শব্দগুলো কীভাবে তোমাকে বর্ণনা করে তা নিয়ে। ৩০ সেকেন্ডের জন্য এক পৃষ্ঠাই যথেষ্ট।

আমার ক্ষেত্রে- আমি একজন শিক্ষক। আমি অনলাইনে পড়াই। আমি একজন বক্তা হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কথা বলি, বক্তব্য দেই। টেন মিনিট স্কুল আমার নিজের একটি উদ্দ্যোগ।

৩. নিয়মিত অনুশীলন করোঃ

প্রতিদিন আয়নার সামনে বারবার অনুশীলন করো। বন্ধুদের সাথেও অনুশীলন করা যেতে পারে। তাহলে, জড়তা কেটে যাবে। অডিও বা ভিডিও রেকর্ডও করা যেতে পারে যাতে করে কণ্ঠের অবস্থা আর বলার ভঙ্গিমা সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়।

আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এই 'Elevator Pitch' যত দ্রুত সম্ভব তৈরি করে ফেলাটা খুব জরুরি। তা না হলে, যদি কখনও এমন কোনও বিখ্যাত কেউ বা তোমার খুব প্রিয় কোনও মানুষ কিংবা এমন কারও সামনে তোমাকে পড়তে হয়, যার সাথে দেখা করতে অনেকদিন ধরেই তুমি খুব

আগ্রহী ছিলে, যাকে বলার জন্য হয়তো অনেক কথাও তোমার তৈরি ছিলো কিংবা যে হয়তো তোমার খুব বড় কোনও কাজে আসতে পারেন কিন্তু শুধুমাত্র ওই বিশ-ত্রিশ সেকেন্ড সময়টুকুর যথাযথ প্রয়োগ না করতে পারার কারণে তোমার কথাগুলো তাকে বলা হয়ে উঠবে না।

এমনটা আমাদের সবার সাথে ইতিপূর্বে ঘটেছে, এখনও ঘটছে। আর, 'Elevator Pitch' তৈরি না থাকলে ভবিষ্যতেও ঘটবে। যেটা, আশা করি আমাদের কারও কাম্য নয়! আর তাই এক্ষেত্রে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের সবাইকে নিজেদের গন্ডির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে উপস্থাপন করতে শিখতে হবে।

অন্যথায়, এ নেটওয়ার্কিং এর যুগে কেবলমাত্র নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরতে না পারার কারণে অনেক সময় ক্ষেত্রবিশেষে নিজের সর্বোচ্চ টুকু দেওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যেতে পারো।

"Never Stop Learning"

আয়মান সাদিক

প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

টেন মিনিট স্কুল (www.10minuteschool.com)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউট (IBA) থেকে পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে টেন মিনিট স্কুলের (10 Minute School) সাথেই সম্পূর্ণভাবে যুক্ত আছেন যেখানে দৈনিক দুই লক্ষাধিক শিক্ষার্থী বিনামূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি তিনি প্রতিদিনই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তা ও প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালায় অংশ নিয়ে থাকেন।

তার ব্যতিক্রমী উদ্দ্যোগের সম্মাননাস্বরূপ তিনি বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কারের পাশাপাশি Queen's Young Leader Award, Future Leaders' League, One Young World Ambassador সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর স্বপ্ন, একদিন বাংলাদেশের ৪ কোটি ২৭ লক্ষ নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ও ১ লক্ষ ৭০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেন মিনিট স্কুলের সাথে যুক্ত থাকবে। বাংলাদেশের সকল স্থানের শিক্ষার্থীরা যেন যে কোনো মুহূর্তে সব প্রকার শিক্ষা উপকরণ ও সহায়তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিজেদের হাতের মুঠোয় পেতে পারে সেটা নিশ্চিত করাই তাঁর লক্ষ্য।

BE HAPPY & SPREAD HAPPINESS
"Hello"
idea
CV
Constructive Criticism
Interview
Happiness